বিজ্ঞানের ১০০ আবিষ্কার

বিজ্ঞানের ১০০ আবিষ্কার

শান্তা শ্রীমানী

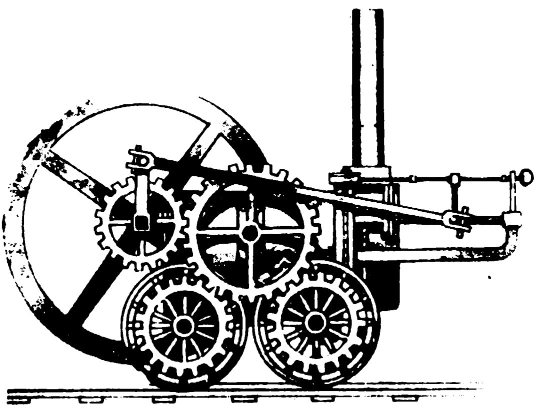

পত্রলেখা
৯/৩ টেমার লেন, কলিকাতা-৯

www.purepdfbook.com

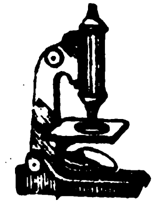

প্রথম প্রকাশ/জানুয়ারী '৯৮ কলকাতা বইমেলা
প্রকাশক/ পত্রলেখা, গুণেন শীল, ৯/৩ টেমার লেন, কলিকাতা-৯
অক্ষর বিন্যাস/ডি এণ্ড বি ডেটা সার্ভিসেস, কলি-৫৪
মুদ্রক/ লক্ষ্মীনারায়ণ প্রসেস, গোয়াবাগান
পরিকল্পনা/শীলজী
প্রচ্ছদ/শ্রীরূপ

ত্রিশ টাকা

www.purepdfbook.com

১০ মিনিট স্কুল all pdf বই - Click here

কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স 2021 all Month pdf - Click here

আয়মান সাদিক ও সাদমান সাদিক ভাইদের all pdf বই - Click here

এরকম আরো বই পেতে ভিজিট করুন↓
https://www.purepdfbook.com

ফেসবুকে আমি - মোঃহৃদয়

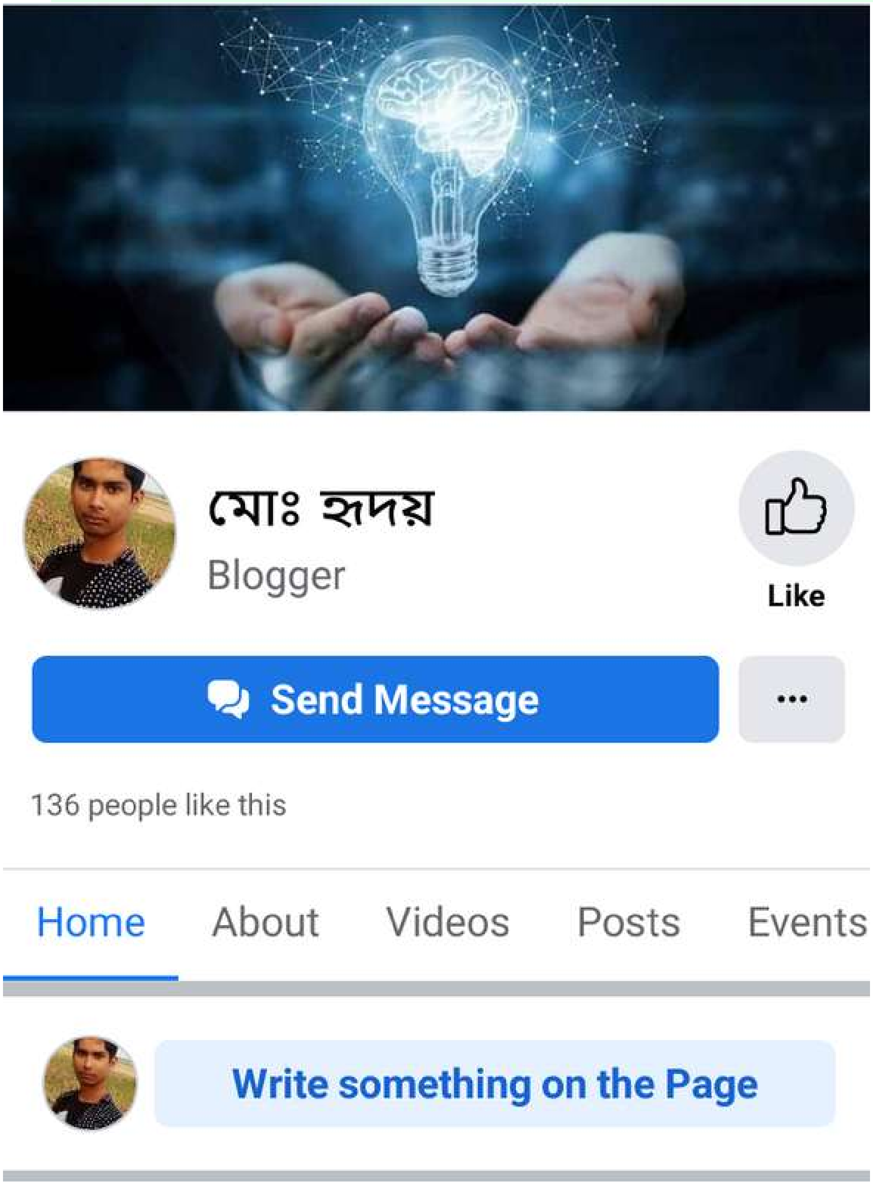

এই প্রসঙ্গে

সুইচ টিপলেই জ্বলে উঠছে আলো, 'হ্যালো হ্যালো' বলে টেলিফোনে দূরপ্রান্তের মানুষের সাথে কথা বলে নিচ্ছি, টেলিভিশনের পর্দায় চোখ রেখে জেনে নিচ্ছি সারা বিশ্বের খবর। কিন্তু এসব কি একদিনে হয়েছে? মানুষের হাজার হাজার বছরের প্রচেষ্টার ফসল আজকের সভ্যতা। সেই আদিমযুগ থেকেই মানুষ পৃথিবীকে জানতে চেয়েছে, শাসন করতে চেয়েছে। আর তারই ফলে সৃষ্টি হয়েছে এসব।

কেমন করে আবিষ্কার করলেন, কে আবিষ্কার করলেন স্বভাবতই তা জানতে ইচ্ছা হয়। ১০০জন, আবিষ্কারকের কথায় সাজিয়ে দেওয়া হল 'বিজ্ঞানের ১০০ আবিষ্কার'। যাদের জন্য এ বই তাদের ভালো লাগলেই আমাদের শ্রম সার্থক হবে।

জানুয়ারী-'৯৮ ধন্যবাদান্তে

প্রকাশক

www.purepdfbook.com

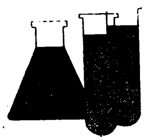

সূচীপত্র

সূর্যরশ্মির সাহায্যে
পিরামিডের উচ্চতা নির্ণয়/৯
শারীরবিদ্যা ও
রোগনিরূপণ বিদ্যার উন্নতি/১০
চুম্বক/ ১২
আর্কিমিডিসের তত্ত্ব/১৩
সৌরশক্তির প্রয়োগ/১৬
প্লাসটিক সার্জারি/১৮
কাগজ/২০
পৃথিবীর সূর্য পরিক্রমা/২১
বারুদ/২৩
দৈর্ঘ্য মাপার একক/ ২৪
পেন্সিল/২৫
মুদ্রণ যন্ত্র/২৬
দোলকের দোলনকাল/২৮
স্থির তড়িৎ/৩০
দূরবীণ/৩১
জীবদেহে রক্ত
সঞ্চালন প্রক্রিয়া/৩৩
ব্যারোমিটার/৩৪
সূর্যরশ্মির বর্ণ বিশ্লেষণ/৩৫
মাধ্যাকর্ষণ শক্তি/৩৭
ফসফরাস/৩৮
দেশলাই/৩৯
থার্মোমিটার/৪১
হাইড্রোজেন গ্যাস ও
জলের স্বরূপ/৪৩
বাষ্পীয় ইঞ্জিন/৪৪
অনুবীক্ষণ যন্ত্র/৪৬
ইউরেনাস/৪৮
বেলুন/৪৯
তড়িৎকোষ/৫১

www.purepdfbook.com

সাইকেল/৫৩
বসন্তের টিকা/৫৪
রসায়নের সাংকেতিক ভাষা/৫৫
পরমাণুবাদ ও পারমাণবিক
ওজনের তালিকা/৫৭
আয়োডিন/৫৮
ডেভির নিরাপত্তা বাতি/ ৫৯
চুম্বক ও
তড়িৎপ্রবাহের সম্পর্ক/ ৬০
তড়িৎপ্রবাহের
সাহায্যে চৌম্বকত্ব সৃষ্টি/৬১
কুইনাইন/৬৩
ডায়নামো/৬৪
গ্যাসের আলো/৬৬
ফটোগ্রাফ/৬৭
ইউরিয়া/৬৯
বাষ্পচালিত রেলগাড়ী/৭০
কম্পিউটার/৭৩
টেলিগ্রাফ/ ৭৫
অ্যাসিটিলিন/৭৬
রাবারের আঠালোভাব
দূরীকরণ/৭৭
ডাকটিকিট/ ৭৮
ব্লটিং পেপার/৮০
গান কটন/৮০
নেপচুন/৮১
নাইট্রো গ্লিসারিন/৮৩
ক্লোরোফর্ম/৮৪
সেলাইকল/৮৬
আলকাতরা/৮৭
কৃত্রিম নীল রং/৮৯
ডিনামাইট/৯০
পার্কেসিন/৯২
কার্বলিক অ্যাসিড/৯৩
সেলুলয়েড/৯৪
টেলিফোন/৯৫
ফনোগ্রাফ/ ৯৬
বৈদ্যুতিক বাতি/ ৯৮
বেঞ্জিন অণুর গঠন/১০০
অ্যানথ্র্যাক্স ও জলাতঙ্ক
রোগের টিকা/১০১
অ্যানথ্র্যাক্স, যক্ষ্মা ও
কলেরার জীবাণু/১০৩
মোটর গাড়ী/১০৫
স্যাকারিন/১০৬
অ্যালুমুনিয়াম/১০৭
ইনসুলিন/১০৮
কৃত্রিম রেশম/১০৯
চলচ্চিত্র/১১১
নিষ্ক্রিয় গ্যাস/১১৩
এক্স-রে/১১৪
বেতার যন্ত্র/১১৬
তেজস্ক্রিয় পদার্থ/১১৮
মারকিউরাস নাইট্রেট/ ১১৯
ক্যাথোড রশ্মি/১২০
ম্যালেরিয়া/১২২

www.purepdfbook.com

গ্যালালিথ বা
কেসিন প্লাস্টিক/১২৩
জীব ও জড়ের
সংবেদনশীলতা/১২৪
রেডিয়াম/১২৬
উড়োজাহাজ/১২৭
নিরাপদ কাচ/ ১২৯
ইলেকট্রন টিউব/১৩০
ফটোইলেকট্রিক এফেক্ট ও আপেক্ষিকতা তত্ত্ব/১৩১
বেকেলাইট/ ১৩৩
টাইটেনিয়াম/১৩৩
তাপীয় আয়নন তত্ত্ব/১৩৪
কালাজ্বর/১৩৭
বোস পরিসংখ্যান পদ্ধতি/ ১৩৮
রকেট/ ১৪০
পেনিসিলিন/১৪২
রামন এফেক্ট/১৪৩
প্লুটো/১৪৫
মহাজাগতিক রশ্মিতে
মেসন কণার উপস্থিতি/১৪৬
যক্ষ্মার প্রতিষেধক স্ট্রেপটোমাইসিন/১৪৮
পলিথিন ও টেরিলিন/১৪৯
পাইরোসেরাম/১৫০
পোলিও রোগের প্রতিষেধক টিকা/১৫২
ইন্টারনেট/১৫৩

www.purepdfbook.com

বিজ্ঞানের ১০০ আবিষ্কার

www.purepdfbook.com

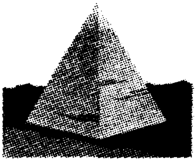

সূর্যরশ্মির সাহায্যে পিরামিডের উচ্চতা নির্ণয় (৬০০ খ্রীঃপূঃ)

থ্যালেস

খ্রীষ্টের জন্মের ৬০০ বছর আগে গ্রীস দেশের মিলেটাস অঞ্চলে বাস করতেন থ্যালেস নামক এক গণিতজ্ঞ এবং দার্শনিক। তিনি প্রকৃতির সবরকমের বস্তুকেই পরিমাপ করতে, তার আকার, আয়তন নির্ণয় করতে চেষ্টা করতেন, পিরামিডের মাথায় না উঠেও মাটি থেকে তার উচ্চতা মাপার জন্য তিনি এক বিশেষ পদ্ধতির আবিষ্কার করেছিলেন। এই উচ্চতা নির্ণয়ের জন্য অবশ্য তাঁকে সূর্যরশ্মির অপেক্ষা করতে হত।

পিরামিডের উচ্চতা নির্ণয়ের জন্য তিনি প্রথমে পিরামিড থেকে কিছু দূরে পিরামিডের ভূমির সমতলে একটি খুঁটি পুঁতলেন। খুঁটিটি যেখানে পুঁতলেন সেই অংশটিকে কেন্দ্র ধরে খুঁটির দৈর্ঘ্যকে ব্যাসার্ধ নিয়ে মাটিতে একটি বৃত্ত টানলেন।

সকালের দিকে যখন সূর্য উঠল তখন পিরামিড খুঁটির ছায়া উভয়েই লম্বা হয়ে পড়ল। সূর্য যত আকাশে ওপরে উঠতে লাগল ছায়া ততই ছোট হতে লাগল। এক সময় দেখা গেল খুঁটির শীর্ষবিন্দুর ছায়া বৃত্তের একটি বিন্দুতে এসে মিলল। সেই বিন্দুটিতে দাগ টেনে তিনি খুঁটিটি যেখানে পোঁতা হয়েছিল অর্থাৎ বৃত্তটির কেন্দ্র থেকে ঐ বিন্দুর দূরত্ব মেপে দেখলেন সেটির দৈর্ঘ্য খুঁটির দৈর্ঘ্যের সমান। কারণ খুঁটির দৈর্ঘ্যকেই ব্যাসার্ধ নিয়ে বৃত্তটি আঁকা হয়েছিল।

থ্যালেস এই সময়ই দেখলেন পিরামিডের শীর্ষবিন্দুর ছায়া একটি বিন্দুতে এসে পড়েছে তিনি সেই বিন্দুটি চিহ্নিত করে সেই বিন্দুটি থেকে পিরামিডের ভূমির মধ্যবিন্দু পর্যন্ত দূরত্বটি মেপে ফেললেন। এবং প্রমাণ করে দিলেন এই দূরত্বের মাপটিই হল পিরামিডের উচ্চতা।

www.purepdfbook.com

এভাবে একটি লাঠি ও তার ছায়ার দৈর্ঘ্যের অনুপাতের সঙ্গে পিরামিড

ও তার ছায়ার দৈর্ঘ্যের অনুপাতের সমতার বিষয়ের সাহায্যে পিরামিডের উচ্চতার পরিমাপ করেছিলেন গণিতজ্ঞ থ্যালেস।

শারীরবিদ্যা ও রোগনিরূপণ বিদ্যার উন্নতি

হিপোক্রেটাস (খ্রীঃপূঃ ৪৬০-৩৭০)

প্রাচীন যুগে গ্রীস দেশে শব ব্যবচ্ছেদ নিষিদ্ধ ছিল। সেই কারণেই মানুষের দেহের অস্থির গঠন ও মাংসপেশীর গঠন প্রত্যক্ষভাবে জানা সম্ভব ছিল না। তবু গ্রীস চিকিৎসক হিপোক্রেটাস বহু দূরারোগ্য ব্যাধি চিকিৎসাপদ্ধতির কথা

 www.purepdfbook.com

তাঁর লিখিত বইয়ের প্রবন্ধগুলিতে উল্লেখ করেছেন।

ভাঙা হাড় জোড়া লাগানো, সরে যাওয়া হাড় ঠিকমত বসানোর জন্য পাতলা কাঠকে কোথায়, কিভাবে দিতে হবে এবং তার ওপরে কিভাবে পটি বাঁধতে হবে সেসব পদ্ধতির কথা তিনি উল্লেখ করেছেন। তাঁর প্রবন্ধগুলি পড়লে বোঝা যায় যে তাঁর অস্থি ও মাংসপেশীর গঠন ও কার্যাবলী সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা ছিল।

অস্ত্রোপচার কেমন ঘরে করা উচিত, অস্ত্রোপচারের যন্ত্রপাতি কিভাবে তৈরী করা উচিত, অস্ত্রোপচারের পর কিভাবে ক্ষতের যত্ন নেওয়া উচিত, রোগীর পথ্য কেমন হওয়া উচিত এবং কিভাবে রোগীর পরিচর্যা করা প্রয়োজন সেসব কিছুরই নির্দেশ পাওয়া যায় তাঁর প্রবন্ধগুলিতে। এইসব নির্দেশ বাস্তবধর্মী এবং আধুনিক পদ্ধতির অনেকটাই কাছাকাছি।

সূর্যকিরণের সাহায্যে নানারকম জটিল রোগ নিরাময় করে তিনি প্রচুর খ্যাতি লাভ করেছিলেন। হিপোক্রেটাস তাঁর প্রবন্ধে লিখেছিলেন যে কোনো রোগ তা যতই ভয়াবহ ও মারাত্মক হোক না কেন, তার সঙ্গত কোনো প্রাকৃতিক কারণ থাকবেই। অনুসন্ধান বা গবেষণা করে চিকিৎসকদের প্রথমেই কারণটি জানতে হবে, পরে যথোপযুক্ত ওষুধ দিয়ে সেই রোগের চিকিৎসা করতে হবে।

তিনি এও লিখেছিলেন যে চিকিৎসক যদি সঠিকভাবে রোগীর রোগ নির্ণয় করতে চান তবে তাঁকে রোগীর পারিবারিক ইতিহাস, তার পেশা, দৈনন্দিন কাজকর্ম, তার পরিবেশ, শারীরিক ও মানসিক অবস্থা এসব খুব ভালভাবে জানতে ও বুঝতে হবে।

হিপোক্রেটাস ছিলেন নিষ্ঠাবান চিকিৎসক। তিনি তাঁর ছাত্রদেরও নিষ্ঠাবান করার উদ্দেশ্যে চিকিৎসক জীবন শুরু করার সময় শপথ বাক্য পাঠ করাতেন। শপথ বাক্যে ছাত্রদের বলতে হত ঃ আমি নিষ্ঠাভরে সারাজীবন ধরে আমার কর্তব্য সম্পাদন করে যাবো এবং আমার পেশার পবিত্রতা অক্ষুন্ন রাখব।

হিপোক্রেটাসের রচনাবলী তাঁর ছাত্ররা খ্রীঃপূঃ তৃতীয় শতাব্দীতে আলেকজান্দ্রিয়ার বিখ্যাত লাইব্রেরীতে সংরক্ষণ করেন। এই রচনাবলীটি সাতাশী খণ্ডে বিভক্ত।

www.purepdfbook.com

চুম্বক

প্রাচীন যুগে গ্রীস দেশের লোকেরা দেখেছিলেন এক ধরণের পাথর আছে যা লোহাকে আকর্ষণ করে। এই পাথর ছিল অম্লযান যুক্ত লোহা, যা প্রাকৃতিক অবস্থায় পাওয়া যেত গ্রীস, উত্তর আমেরিকা ও সুইডেনে। গ্রীসের ম্যাগনেশিয়া অঞ্চলে এ পাথরকে প্রথম দেখা গিয়েছিল বলে গ্রীকরা এই পাথরের নাম দেন ম্যাগনেটাইট। প্রকৃতপক্ষে এই পাথরটি ছিল লোডস্টোন। ম্যাগনেটাইট থেকেই ম্যাগনেট কথাটির উৎপত্তি।

দণ্ডাকৃতি ম্যাগনেটাইট পাথরকে দড়ি দিয়ে ঝুলিয়ে দিলে সেটি সবসময় উত্তর-দক্ষিণ মুখো হয়ে থাকে। আর্কিমিডিসের চোখে এই বৈশিষ্ট্যটি প্রথম ধরা পড়ে। তিনি তখন ঐ পাথরের সাহায্যে আবিষ্কার করলেন দিগদর্শন যন্ত্র বা কম্পাস। ফলে কি দিন কি রাত্রি নাবিকদের জাহাজের দিকনির্ণয় করা সহজ হয়ে গেল।

বৈজ্ঞানিক প্রেরি গ্রীনাস লক্ষ্য করেছিলেন চুম্বক প্রতিবার উত্তর-দক্ষিণ মুখো হয়ে থাকে। এবং চুম্বকের সাথে কোনো লোহার পাত ঘষলে লোহার পাতটিও চুম্বকের মত ছোট ছোট লোহার টুকরোকে আকর্ষণ করে। লোহার পাতটির মধ্যে নতুন যে শক্তি জন্মাল তাকে বলে চৌম্বক শক্তি।

বৈজ্ঞানিক কেলভিন উত্তর-দক্ষিণ মুখো হয়ে থাকা চুম্বকের উত্তর দিকের নাম দেন উত্তর পোল এবং দক্ষিণ দিকের নাম দেন দক্ষিণ পোল।

বৈজ্ঞানিকরা ম্যাগনেট নিয়ে গবেষণা করতে গিয়ে দেখেন ম্যাগনেটের কাছে লোহার চূর ছড়িয়ে দিলে সেগুলি সারিবদ্ধভাবে এক একটি রেখায় দাঁড়িয়ে পড়ে। এই রেখাগুলোর নাম দেওয়া হয় চুম্বকরেখা।

www.purepdfbook.com

আর্কিমিডিসের তত্ত্ব

আর্কিমিডিস (খ্রীঃপূঃ ২৮৭—খ্রীঃপূঃ ২১২)

প্রাচীনকালে গ্রীস দেশের সাইরাকিউজ নামে একটি রাজ্য ছিল। এই দেশে খ্রীষ্টপূর্ব ২৮৭ অব্দে জন্ম হয় আর্কিমিডিসের। তাঁর বাবা ছিলেন বিখ্যাত গণিতবিদ ও জ্যোর্তিবিজ্ঞানী ফিডিয়াস। বাবার মতই আর্কিমিডিসও ছিলেন অসাধারণ পণ্ডিত। তাঁর খ্যাতি ছিল জগৎজোড়া। দিনের পর দিন তিনি কাটিয়ে দিতেন বই পড়ে আর অঙ্ক কষে। আলেকজান্দ্রিয়ার মিউজিয়ামে বিখ্যাত পণ্ডিতদের কাছে তিনি শিক্ষালাভ করেন। আর্কিমিডিসের বন্ধু ছিলেন সাইরাকিউজের রাজা হিয়েরো।

রাজা হিয়েরো আর্কিমিডিসকে মাঝে মাঝেই বলতেন 'কি যে দিনরাত বই পড়। লোকেতো তোমায় কদর দেয় না। মানুষের কাজে লাগে এরকম কোনো যন্ত্র বানিয়ে সবাইকে যদি তাক্ লাগিয়ে দিতে পার তবেই বুঝব তুমি একটা পণ্ডিতের মত পণ্ডিত! রাজার কথা তো আর আর্কিমিডিস ফেলতে পারেন না, তাই নানারকম স্ক্রু, জল তুলবার কপিকল, পাখা টানবার দেয়ালে লাগানো চাকার পুলি, এসব তো আবিষ্কার করলেনই, আবার অঙ্ক কষার সুবিধার জন্য গোলক, পিরামিড, শঙ্কু প্রভৃতি বস্তুর ঘনফল ও ক্ষেত্রফলও বের করলেন। রাজা তো খুব খুশী।

রাজা হিয়েরো একবার এক স্যাকরার কাছে একটি সোনার মুকুট তৈরী করতে দিয়েছিলেন। মুকুটটা নির্দিষ্ট দিনে স্যাকরা রাজার হাতে তুলে দিলেন। মুকুটটি দেখতে চমৎকার হয়েছে। কিন্তু রাজার মনে সন্দেহ হল স্যাকরা বুঝি

www.purepdfbook.com

সোনা চুরি করে খাদ মিশিয়েছে।

তাঁর সন্দেহ সত্যি কিনা তা মুকুট ভেঙে পরীক্ষা করলেই হত। কিন্তু মুকুটটা এতই সুন্দর দেখতে হয়েছে যে সেটা ভাঙতে মন চাইল না রাজার। তাহলে কে তাঁর সন্দেহ মেটাবেন? রাজার মনে পড়ল বন্ধু আর্কিমিডিসের কথা। বন্ধুকে ডেকে তিনি বললেন 'মুকুটটা না ভেঙে সোনায় খাদ মেশানো আছে কিনা জানাও'। মুকুট না ভেঙে যে কি করে খাদের পরিমাণ বের করবেন তা তো ভেবেই পেলেন না আর্কিমিডিস। কিন্তু একে বন্ধু তায় রাজার কথা, সে কি আর এককথায় নাকচ করা যায়! তাই বললেন 'কয়েকটা দিন সময় পেলে এর একটা উপায় হয়ত খুঁজে পাব।' রাজা বললেন, 'বেশ। তবে উপায় না খুঁজে পেলে রক্ষা নেই তোমার।'

কয়েকদিন কেটে গেল। উপায় যে কি খুঁজে বের করবেন মাথায় আসে না আর্কিমিডিসের। খালি ভাবেন যদি উপায় না পাই তবে আর রক্ষে নেই। সর্বক্ষণ একই চিন্তা তাঁর মাথায়। অন্যমনস্ক হয়েই খান, ঘুমোন, স্নান করেন।

আর্কিমিডিসের স্নান ঘরে ছিল একটি জল ভর্তি স্নানের টব। রোজ সেখানে নেমেই স্নান করতেন তিনি। একদিন মুকুটের কথা ভাবতে ভাবতে স্নানের টবে নেমেছেন। সেদিন টবটা ছিল জলে পরিপূর্ণ। যেই তিনি সেই টবে নামলেন অমনি বেশ কিছুটা জল উপচে মেঝেতে পড়ে গেল। সেই ঘটনা দেখে বিদ্যুৎ চমকের মত তাঁর হঠাৎ মনে হল জলপূর্ণ টবে তিনি নামলেন বলেই জল উপচে পড়ল, তাহলে জলপূর্ণ পাত্রে কোনো বস্তুকে ডোবালে নিশ্চয়ই কিছু না কিছু জল উপচে পড়বেই। এই উপচে পড়া জলের ওজন আর বস্তুর ওজনের তুলনা করলেই বস্তুর ঘনত্ব পাওয়া যাবে। এভাবে হঠাৎ মুকুটে খাদ মেশানো আছে কিনা তার উপায় বের করার পথ খুঁজে পেয়ে তিনি আনন্দে আত্মহারা হয়ে গেলেন, স্নানের কথা ভুলে গেলেন তিনি। ঐ ভিজে অবস্থাতেই তিনি 'ইউরেকা ইউরেকা' বলতে বলতে ছুটলেন রাজসভার দিকে।

রাজসভায় গিয়ে আর্কিমিডিস রাজাকে বললেন সেই মুকুট, একটি জল ভর্তি পাত্র এবং কিছু পরিমাণ খাঁটি সোনা দিতে। এবার তিনি সোনার মুকুটটিকে নিয়ে ওজন করে তারপরে সেটিকে জলে ডুবিয়ে তার অপসারিত জলের ওজন নিলেন এবং ঐ দুই ওজনের তুলনা করে ঘনত্ব বের করলেন

www.purepdfbook.com

মুকুটির। এবার ঐ খাঁটি সোনাকে ওজন করে, জলে ডুবিয়ে তার অপসারিত-জলের ওজন করে সোনার ঘনত্ব বের করলেন। এভাবে তিনি খাঁটি সোনার ঘণত্বের সাথে মুকুটের সোনার ঘনত্বের তফাত দেখিয়ে প্রমাণ করে দিলেন যে মুকুটটিতে খাদ মেশানো আছে।

মুকুটের সমস্যা সমাধানের থেকেই আর্কিমিডিস আবিষ্কার করলেন এক সূত্র। এই সূত্র থেকে জানা যায় কোনো বস্তুকে সম্পূর্ণ বা আংশিকভাবে জলে বা অন্য কোনো তরলে নিমজ্জিত করলে বস্তু তার নিজ আয়তনের সমান জল বা তরল অপসারণ করে। নিমজ্জিত করার ফলে বস্তুর যে পরিমাণ ওজন হ্রাস হয়, অপসারিত জলের ওজন ঠিক ততখানি। এই বিখ্যাত সূত্রকে বলে আর্কিমিডিস সূত্র।

আর্কিমিডিস এভাবে তাঁর জ্ঞান ও বুদ্ধিকে কাজে লাগিয়ে বিজ্ঞান চর্চার নানান উন্নতি ঘটিয়েছিলেন। রোমান সৈন্যদের হাত থেকে রক্ষা করেছিলেন তার জন্মভূমি সাইরাকিউজকে।

কিন্তু তাঁর বহু প্রচেষ্টা সত্ত্বেও রোমান সেনাপতি মার্সেলাস দীর্ঘ আটমাস ধরে আক্রমণ ও অবরোধ চালিয়ে খ্রীষ্টপূর্ব ২১২ অব্দে সাইরাকিউজ দখল করেন।

মার্সেলাস শুনেছিলেন বিখ্যাত পণ্ডিত আর্কিমিডিসের নাম। তাই সৈন্যদের নগর লুঠ করার সম্মতি দিলেও বলে দিয়েছিলেন তারা যেন আর্কিমিডিসের কোনো ক্ষতি না করে। সৈন্যরা তো আর আর্কিমিডিসকে চিনত না। তাই শহরের লোকদের ধরে ধরে তাদের পরিচয় জিজ্ঞাসা করছিল তারা। এমন সময় প্রায় পঁচাত্তর বছরের এক বৃদ্ধ লোককে বালির ওপর ছক কাটতে দেখে তারা জিজ্ঞাসা করে আপনি কি আর্কিমিডিস? কিন্তু আর্কিমিডিস তখন তাঁর গবেষণায় এতই ডুবে গেছিলেন যে হাত তুলে তাদের বিরক্ত করতে বারণ করলেন। সৈন্যরা সকলের ওপর কর্তৃত্ব করতে অভ্যস্ত। কোন্ এক পাগল বুড়োর কথা তারা মানবে কেন? সঙ্গে সঙ্গে আর্কিমিডিসের মাথা তাঁর দেহ থেকে ছিন্ন হয়ে মাটিতে পড়ে গেল।

এখবর শুনে দুঃখে-লজ্জায় মাথা নীচু হয়ে গিয়েছিল সেনাপতি মার্সেলাসের। তাঁর পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতেই তিনি আর্কিমিডিসকে অতিযত্নে কবরে শায়িত করে তাঁর কবরের ওপর একটি সুন্দর সমাধি তৈরী করেছিলেন।

www.purepdfbook.com

পোলিও রোগের প্রতিষেধক টিকা (১৯৫৩)

জোনাস সল্ক (১৯১৪-)

পোলিওমাইলাইটিস বা পোলিও রোগ হল শিশু পক্ষাঘাত। সাধারণতঃ শিশুদের এ রোগ হয়। বড়দেরও যে একেবারে হয়না তা নয়। পোলিও রোগ একসময় মহামারীর মত পঙ্গু করে দিত হাজার হাজার শিশুকে। পোলিও রোগে আক্রান্ত হয়ে অনেকে দীর্ঘদিন রোগ ভোগের পর মারা যায়। যারা বেঁচে থাকে তারাও বিকলাঙ্গ হয়ে পড়ে। শিশুর পক্ষাঘাতগ্রস্থ অঙ্গের পেশীগুলি অপুষ্ট থাকায় ধীরে ধীরে শুকিয়ে যায়, ফলে সেই অঙ্গগুলিও বিকলাঙ্গ হয়ে যায়। এইরকম ভয়ঙ্কর রোগের কবল থেকে শিশুদের রক্ষা করতে এগিয়ে এসেছিলেন বিজ্ঞানী জোনাস সল্ক।

১৯৩৯ সালে এম. ডি ডিগ্রী নিয়ে নিউইয়র্কের মেডিক্যাল স্কুল থেকে ডাক্তারী পাশ করার পর জোনাস সল্ক প্রথমে জীবাণুতত্ত্ববিদ হিসাবে কাজ করতেন। ডাক্তারী পড়ার সময় তাঁর সাথে পোলিও রোগ বিশেষজ্ঞ ডঃ মরিসব্রডি ও ইনফ্লুয়েঞ্জা বিশেষজ্ঞ ডঃ ফ্রান্সিসের পরিচয় হয়।

১৯৪২ সাল থেকে ডাঃ সল্ক মিচিগান বিশ্ববিদ্যালয়ের রিসার্চ ফেলো হয়ে ইনফ্লুয়েঞ্জার টিকা আবিষ্কারের জন্য গবেষণা শুরু করেন।

১৯৪৭ সালে পিটাসবার্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইরাস গবেষণাগারের ডিরেক্টরের পদ পাওয়ায় তিনি ইনফ্লুয়েঞ্জার কাজ বন্ধ রেখে পোলিওর টিকা আবিষ্কারের জন্য গবেষণা শুরু করেন। আমেরিকার পোলিও গবেষণাগার তাঁকে অর্থ সাহায্য করতে থাকে।

ডঃ সল্ক একহাজার পোলিও রোগীর দেহ থেকে পোলিও ভাইরাস নিয়ে

www.purepdfbook.com

সৌর শক্তির প্রয়োগ (২১৫ খ্রীঃপূঃ)

আর্কিমিডিস (খ্রীঃপূঃ ২৮৭—খ্রীঃপূঃ ২১২)

সূর্যরশ্মির মধ্যে যে এক অভূতপূর্ব শক্তি লুকিয়ে আছে এ তথ্য প্রথম আবিষ্কার করেছিলেন আর্কিমিডিস।

আর্কিমিডিস সিসিলির সাইরাকিউসের রাজা হিয়েরোর আত্মীয় ও বন্ধু ছিলেন।

রোম দেশের সেনাপতি মার্সেলাস তাঁর বিরাট সেনাবাহিনী নিয়ে স্থলে ও জলপথে ২১৫ খ্রীষ্ট পূর্বাব্দে সাইরাকিউস আক্রমণ করতে এসেছিলেন। তখন রাজা হিয়েরো শত্রুর হাত থেকে দেশকে বাঁচাবার জন্য আর্কিমিডিসের সাহায্য চেয়েছিলেন।

আর্কিমিডিস আবিষ্কার করেছিলেন অবতল আয়নায় সূর্যরশ্মি কেন্দ্রীভূত করে কোনো বস্তুর ওপর প্রতিফলিত করলে সেই বস্তুতে আগুন জ্বালিয়ে দেওয়া যায়। এজন্য তিনি সরার মত গর্তওয়ালা বড় বড় অবতল আয়না তৈরী করে সমুদ্রের ধারে অর্ধচন্দ্রাকারে সেগুলিকে সাজিয়ে রেখেছিলেন। অবতল আয়নায় সূর্য রশ্মি কেন্দ্রীভূত হতেই তিনি আয়নাগুলি প্রতিফলিত করেন রোমান জাহাজগুলির ওপর। ফলে যুদ্ধ জাহাজের পালে আগুন লেগে রণতরীগুলো ধ্বংস হয়ে যায়। মানুষের প্রয়োজনে এই প্রথম সৌরশক্তিকে কাজে লাগানো হয়।

প্রাচীন যুগে এথেন্স বাসীরা তাদের দেবী ভেস্টার পূজার জন্য মসৃণ সোনার পাতে সূর্য রশ্মি কেন্দ্রীভূত করে পবিত্র অগ্নিশিখা জ্বালাতেন।

বর্তমান যুগেও মানুষ সৌরশক্তিকে কাজে লাগানোর প্রচেষ্টা শুরু করেছে। আমাদের প্রতিদিনের ব্যবহার্য বস্তুগুলোর শক্তির উৎস হল বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই কয়লা ও পেট্রোলিয়াম। পারমাণবিক শক্তির উৎস হল ইউরেনিয়াম নামের একটি তেজস্ক্রিয় ধাতু, অত্যধিক ব্যবহারের ফলে এইসব উৎসগুলি এক সময় পৃথিবী থেকে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবার সম্ভাবনা আছে। তাই স্বল্প ব্যয়ে

www.purepdfbook.com

সৌরশক্তি সংগ্রহ করার কথা মানুষ ভাবতে শুরু করে। বিজ্ঞানীরা হিসাব করে দেখেছেন প্রতি ১০০ ফুট জায়গায় যে সৌর রশ্মি এসে পড়ে তার তাপশক্তির পরিমাণ এক কিলো ক্যালরি। গ্রীষ্মপ্রধান দেশে এর পরিমাণ আরো বেশী।

এই সৌরশক্তিকে নানা কাজে ব্যবহার করা যায়।

প্রথমতঃ সৌরশক্তির মাধ্যমে শীতের দিনে বাড়ীকে গরম রাখার পদ্ধতি। এরজন্য দরকার সৌরশক্তি সংগ্রাহক যন্ত্র। এ যন্ত্রে সোডিয়াম সালফেট, ক্যালসিয়াম ক্লোরাইড প্রভৃতির টুকরো অ্যালুমিনিয়মের একটি পাত্রের মধ্যে রাখা হয়। পাত্রের মুখে ঢাকা থাকে স্বচ্ছ কাচের পাত। কালো রঙ বেশী তাপ শোষণ করতে পারে বলে পাত্রের ভেতরে থাকে কয়েকসারি কালো কাচের পাত। সূর্যরশ্মি ঢাকনার ভেতর দিয়ে কালো কাচের পাতে পড়তেই উত্তপ্ত হয়। পাত্রের মধ্যে থাকে নালীপথ। বাড়ীর ঠাণ্ডা বাতাস সেই নালীপথে ঢুকলেই গরম হয়ে ওঠে। এই গরম বায়ুকে বাড়ীর বিভিন্ন ঘরে পাঠাবার ব্যবস্থা করা হয়। এভাবে পুরো বাড়ীটাই গরম হয়ে ওঠে।

রান্নার কাজেও সৌরশক্তিকে কাজে লাগানো যায়। সৌর উনানে তাপ অন্তরক ও বায়ুনিরোধক বাক্সের মুখে স্বচ্ছ কাচের ঢাকনা থাকে। বাক্সের ভেতরের দেওয়ালে থাকে গাঢ় কালো রঙের প্রলেপ। অবতল আয়নার সাহায্যে সূর্যরশ্মি কেন্দ্রীভূত করে বাক্সের ওপর ফেলা হয়। ইসরায়েলেও ঐ একই পদ্ধতি অনুসরণ করে সৌরশক্তিকে সৌর জলাশয়ে সঞ্চিত করে সেই শক্তিকে রূপান্তরিত করা হয়েছে বাষ্পীয় শক্তি ও বৈদ্যুতিক শক্তিতে। সূর্যরশ্মিকে অবতল লেন্স দিয়ে কেন্দ্রীভূত করে অতি অল্প জায়গায় তিনহাজার ডিগ্রী সেণ্টিগ্রেডের মত তাপ সৃষ্টি করে সেই তাপশক্তিকেই কাজে লাগানো হচ্ছে।

তাপশক্তি থেকে সরাসরি বিদ্যুৎশক্তিতে রূপান্তরিত করা যায়। দুটি ভিন্ন ধাতুর তারের দুইধার জোড়া লাগিয়ে সেই জোড়া দেওয়া স্থানটাকে সূর্যরশ্মি দিয়ে বিভিন্ন উষ্ণতায় গরম করলে তারের দুই ধারের তড়িৎ চালক বলের তারতম্য ঘটে বলে এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত তড়িৎ প্রবাহ পরিচালিত হয়, এই তড়িৎকে বলে থার্মোইলেকট্রিসিটি।

একটা বড় অবতল আয়নার সাহায্যে সূর্য রশ্মি কেন্দ্রীভূত করে বয়লারের

www.purepdfbook.com

জলে ফেললে জল উত্তপ্ত হয়ে বাষ্পীভূত হয়। তখন সেই বাষ্পশক্তিকে কলকারখানার কাজে লাগানো যায়।

সৌরশক্তিকে কাজে লাগিয়ে বিদ্যুৎকোষ, প্রোটিনও স্নেহজাতীয় পদার্থে সমৃদ্ধ ক্লোরেলা চাষ, সমুদ্রের লবণাক্ত জলকে পাতিত করা, প্রভৃতি সব কাজই সম্ভব হচ্ছে।

প্লাসটিক সার্জারি

প্রাচ্যে আবিষ্কার (২০০ খ্রীষ্ট পূর্বাব্দে)

সুশ্রুত

বৈদিক ঋষি বিশ্বামিত্রের বংশধর সুশ্রুত বারানসীর দিভোদাস ধন্বন্তরির আশ্রমে অস্ত্রচিকিৎসা ও ঔষধাদি প্রয়োগবিদ্যা শিক্ষা করেছিলেন। সুশ্রুত একটি বৈজ্ঞানিক যুক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত বই লিখেছিলেন। বইটির নাম সুশ্রুত সংহিতা। পরবর্তীকালে বুদ্ধ যুগে এই বইটির সংস্কার করেন নাগার্জুন। অস্ত্রচিকিৎসায় ব্যবহৃত যন্ত্রপাতি আগুনে পুড়িয়ে বা গরম জলে ফুটিয়ে জীবাণুমুক্ত করা, অস্ত্র চিকিৎসার আগে রোগীকে সুরাপান করিয়ে ব্যথার বোধশক্তি কমানোর কথা সুশ্রুতই প্রথম বলেছিলেন।

খ্রীষ্টজন্মেরও দুশো বছর আগে সুশ্রুত কপাল বা গাল থেকে চামড়ার ফালি তুলে নিয়ে নাক, কান, গলা প্রভৃতি অস্ত্রোপচারের জায়গায় জোড়া লাগিয়ে সেখানকার স্বাভাবিক সৌন্দর্য ফিরিয়ে আনতে সক্ষম হয়েছিলেন। তাঁর এই পদ্ধতির সঙ্গে আধুনিক প্লাস্টিক সার্জারীর কোনোই পার্থক্য নেই।

www.purepdfbook.com

পাশ্চাত্যে আবিষ্কার
আইভারসন

আধুনিক চিকিৎসাবিজ্ঞানের প্লাস্টিক সার্জারীর আবিষ্কারক হলেন আইভারসন নামক এক শল্য চিকিৎসক। তাঁর কাছে একবার এসেছিলেন এক তরুণী। বসন্তের দাগে তার মুখ ক্ষত বিক্ষত। সেই ক্ষতের দাগ যদি সারানো যায় সেই আশা নিয়ে তিনি এসেছিলেন চিকিৎসক আইভারসন এর কাছে।

কিন্তু তখনও চামড়ার ক্ষতের দাগ মুছে ফেলার উপায় আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞানে আবিষ্কৃত হয়নি। আইভারসন উঠে পড়ে লাগলেন সেই অজানা উপায়কে খুঁজে বের করার জন্য।

একদিন আইভারসন হাঁটছেন রাস্তা দিয়ে, দেখলেন এক রেডইণ্ডিয়ান আদিবাসী রাস্তার ধারে বসে কয়েক জনের হাতে উল্কি কেটে দিচ্ছে। ডাক্তার কি এক কৌতূহলে গেলেন ঐ আদিবাসীর কাছে। সম্ভ্রান্ত চেহারার একজন মানুষ তার কাছে উপস্থিত দেখে আদিবাসীটি উৎসাহিত হয়ে বলল 'আপনি কি উল্কি কাটবেন? আমার কাছে কাটিয়ে দেখুন, যদি পছন্দ না হয় ঐ উল্কি আমি তুলে দেব।' ডাক্তার অবাক হয়ে বললেন 'উল্কি আবার তুলে দেওয়াও যায়? কই দেখি উল্কি কাটিয়ে সে উল্কি আবার তুলতে পার কিনা?' এই বলে তিনি তাঁর হাত বাড়িয়ে দিলেন।

আদিবাসীটি তখন তাঁর হাতে উল্কি কাটিয়ে দিয়ে তারপর উল্কি তোলার জন্য খানিকক্ষণ পরে ঐ জায়গায় জোরে পাথর ঘষতে লাগল। ব্যাপারটা খুবই বীভৎস। কিন্তু ডাক্তার আইভারসন আদিবাসীটির কাজের পদ্ধতি বিশ্লেষণ করতে লাগলেন।

উল্কি কাটানোর জায়গার চামড়ায় পাথর ঘষে পুরোটা তুলে ফেলে আদিবাসীটি সেখানে ঔষধি পাতা বেটে দিয়ে কাপড় দিয়ে বেঁধে দিল। কদিন ঐ অবস্থাতেই ক্ষতস্থানকে রেখে দিতেও বলে দিল। কদিন পর ডাক্তার ক্ষতস্থানের কাপড় খুলে দেখলেন কোনো ক্ষতের দাগ আর নেই। সেখানে তৈরী হয়েছে নতুন চামড়ার স্তর। ডাক্তার তখন বুঝলেন আমাদের ত্বকের মধ্যে কয়েকটি স্তর থাকে। যদি ক্ষত ত্বকের দ্বিতীয় স্তর পর্যন্ত পৌঁছায় তবে

www.purepdfbook.com

সেই ক্ষতের দাগ তোলার জন্য ত্বকের বাইরের স্তর গুলি তুলে ঔষধ দিয়ে বেঁধে রাখলেই স্বাভাবিকভাবে নতুন চামড়া গজায়। এইভাবেই পাশ্চাত্যে প্লাস্টিক সার্জারি আবিষ্কৃত হল।

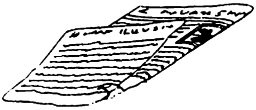

কাগজ (১০৫)

টি-সাই লুঁ

আদিম যুগে মানুষ পাথরে খোদাই করে, নরম মাটির ফলকে, গাছের ছাল, তালপাতা এমনকি পশুর চামড়ার ওপর ছবি এঁকে ও লিখে মনের ভাব প্রকাশ করেছে।

৬০০০ বছরেরও আগে মিশরে প্যাপিরাস গাছের কচি ছাল পিটিয়ে কাগজের মত একটি জিনিস তৈরী করে তাতে লেখা হয়েছিল। এই প্যাপিরাস থেকে 'পেপার' শব্দটি এসেছে।

কাগজ তৈরী করতে প্রথম শিখেছিল চীনদেশের লোকেরা। ১০৫খ্রীঃ টি-সাই-লুঁ নামক এক চীনদেশের লোক তিসি ও শনের তন্তু থেকে মণ্ড তৈরী করে তার থেকে পাতলা চাদরের মত কাগজ তৈরী করেন। ঘাস, বাঁশ প্রভৃতি উদ্ভিদ থেকেও মণ্ড তৈরী করে কাগজ তৈরী করা হত। অষ্টম শতাব্দীতে চীনাদের প্রচেষ্টায় প্রথম কাগজ শিল্প গড়ে ওঠে সমরখন্দে।

প্রথমদিকে ছেঁড়া কাপড় থেকে হাতে কাগজ তৈরী করা হত। ছেঁড়া পরিষ্কার কাপড়কে ভিজিয়ে তাকে থেঁতো করে দেওয়া হত। ফলে কাপড় ছিঁড়ে টুকরো হয়ে আঁশ বেরিয়ে আসত, তাতে জল মিশিয়ে পাতলা মণ্ডের মত করা হত। এই মণ্ডকে চালনিতে ছেঁকে তারপর বেলন দিয়ে বেলে কাগজ তৈরী কত।

পরবর্তীকালে ১৮৬৫ সালে পর থেকে বৈজ্ঞানিক ট্রিলঘ্ম্যান আবিষ্কৃত যান্ত্রিক পদ্ধতিতে কাগজ তৈরী হতে থাকে। এভাবে কাগজ তৈরী জন্য

www.purepdfbook.com

লাগে সেলুলোজ। এই সেলুলোজ পাওয়া যায় পাইন ও ফার গাছের কাঠ, বাঁশ, সাবাই ঘাস প্রভৃতি থেকে। কাগজ তৈরীর জন্য কাঠ বা বাঁশের ছোট ছোট টুকরোকে সালফিউরাস অ্যাসিড ও চুন মিশিয়ে ঘূর্ণায়মান যাঁতাকলে প্রথমে পেষা হয়, পেষার পর জল দিয়ে ভিজিয়ে বার বার পিটিয়ে আঁশগুলিকে বের করে নিয়ে তৈরী হয় নরম মণ্ড, সাদা পরিষ্কার কাগজ তৈরীর জন্য সেলুলোজ থেকে লিগনিনকে আলাদা করতে হয়। তাই মণ্ডের মধ্যে কস্টিক সোডা মেশানো হয় ফলে লিগনিন দ্রবীভূত হয় ও মণ্ড নরম হয় এবং তাপ ও চাপ দিলেই লিগনিন আলাদা হয়ে যায়। লিগনিন মুক্ত সেলুলোজ মণ্ডকে জলে ধুয়ে পরিষ্কার করে তারপর গাঢ় করে ক্লোরিন গ্যাসের সাহায্যে পরিষ্কার সাদা রঙের করা হয়।

কাগজকে শক্ত ও মসৃণ করার জন্য 'বিটার' যন্ত্রে ফেলে সেলুলোজ মণ্ডকে সাইজিং করে নিতে হয়। সাইজিং করার সময় ক্যালসিয়াম সালফেট, বেরিয়াম সালফেট প্রভৃতি দেওয়া হয়। সাইজিং হয়ে গেলে মণ্ডকে কাগজের আকার দেওয়ার জন্য ফোর ড্রাইনার যন্ত্রে দেওয়া হয়। যন্ত্র থেকে বের হওয়া কাগজ প্রথমে ভিজে থাকে। তাকে শুকিয়ে মসৃণ করে মাপ অনুযায়ী কেটে বিক্রির জন্য তৈরী হয়।

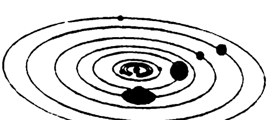

পৃথিবীর সূর্য পরিক্রমা

প্রাচ্যে (২১ মার্চ ৪৯৯)

আর্যভট্ট

পাশ্চাত্যে (২৪ মে ১৫৪৩)

নিকোলাস কোপার্নিকাস (১৪৭৩—১৫৪৩)

খ্রীষ্ট জন্মের প্রায় পাঁচশ বছর পর ৪৯৯ খ্রীষ্টাব্দের ২১ শে মার্চ। কুসুমপুরের (পাটনা) কাছে নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের খগোল মানমন্দিরে প্রখ্যাত

www.purepdfbook.com

ভারতীয় জ্যোতির্বিদ আর্যভট্ট এক নতুন তত্ত্ব সম্বলিত গ্রন্থ 'আর্যভট্টীয়' উদ্বোধন করেন। এই গ্রন্থের মাধ্যমে তিনি প্রথম প্রমাণ করেন পৃথিবী গোল, এবং নিজ অক্ষরেখার ওপর আবর্তন করছে। এই আবর্তনের জন্যই দিন ও রাত্রির সৃষ্টি। তিনি বলেন চাঁদ সূর্যের আলোতেই আলোকিত। পৃথিবীর ছায়া চাঁদে পড়লে হয় চন্দ্রগ্রহণ এবং চাঁদের ছায়া পৃথিবীতে পড়লে সূর্যগ্রহণ হয়। তবে তাঁর একটি ভ্রান্ত ধারণা ছিল যে এই ব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত গ্রহ-নক্ষত্র পৃথিবীকে কেন্দ্র করে ঘুরছে। আর্যভট্টের এই তত্ত্ব প্রাচীন ভারতের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থেকে গেছিল।

পরবর্তীকালে ষোড়শ শতাব্দীতে ১৫৪৩ সালের ২৪শে মে প্রাশিয়া থেকে নিকোলাস কোপার্নিকাস নামক এক বিজ্ঞানী আকাশ পর্যবেক্ষণ করে সিদ্ধান্তে আসেন যে সৌরজগতের কেন্দ্রে রয়েছে সূর্য। সূর্যকে কেন্দ্র করে গ্রহগুলি বৃত্তাকার পথে পরিভ্রমণ করছে। পৃথিবীর আহ্নিক গতির জন্যই দিনরাত্রির সৃষ্টি এবং উত্তর-দক্ষিণ মেরু একটু চাপা।

ষোড়শ শতাব্দীতে পোপদের ছিল ভয়ংকর প্রতাপ। তাঁরা বলতেন ঈশ্বরই পৃথিবী ও মানুষকে সৃষ্টি করেছে। ঈশ্বরের নির্দেশে চাঁদ, সূর্য, গ্রহ, তারা পৃথিবীর চারদিকে ঘুরছে এবং পৃথিবী স্থির আছে। পোপদের এই অভিমত সমস্ত মানুষ এমনকি রাজাকেও মেনে নিতে হত। কোপার্নিকাস পেশায় ছিলেন পাদ্রী, ধর্মশাস্ত্র পড়েও তিনি অন্ধবিশ্বাসী ছিলেন না। গণিতে তিনি ছিলেন সুপণ্ডিত। কিন্তু তিনি জানতেন তাঁর সিদ্ধান্ত প্রচার করলে পোপ তাঁকে ছেড়ে দেবে না। তাই ল্যাটিন ভাষায় 'রিভলিউসানস' নামক একটি বৈজ্ঞানিক গ্রন্থ তিনি লিখেছিলেন এবং তাঁর ইচ্ছানুসারে তাঁর মৃত্যুর পর বইটি প্রকাশিত হয়। প্রকাশ পাওয়ামাত্রই বইটি নিয়ে হৈ চৈ শুরু হয়ে যায়। কোপার্নিকাসকে হাতে না পেয়ে বাধ্য হয়ে পোপ ঐ বইটিকেই বাজেয়াপ্ত করে দেন।

দীর্ঘদিন পর গ্যালিলিও গ্যালিলি ৪০ বছর বয়সে ১৬০৪ সালে কোপার্নিকাসের মত সমর্থন করেন এবং দূরবীনের মাধ্যমে সেই মতকে চতুর্দিকে প্রচার করতে শুরু করেন। পোপ তখন গ্যালিলিওকে ভয় দেখিয়ে জানিয়ে দিলেন তিনি যদি নিজেকে বাঁচাতে চান তবে যেন তাঁর মতামত আর প্রচার না করেন। কিছুদিন চুপ করে বসে থাকলেও গ্যালিলিও সত্যকে

www.purepdfbook.com

অস্বীকার করতে পারলেন না। এজন্য তাঁকে অসহ্য অত্যাচার ও কারাগারের যন্ত্রণাও সহ্য করতে হয়েছিল। শেষপর্যন্ত পোপের ভয়ে তাঁকে তাঁর মত অস্বীকার করতে হয়েছিল। তবু তিনি তাঁর এক বন্ধুকে জানিয়ে ছিলেন 'অস্বীকার করলে হবে কি? এই পৃথিবী এখনও চলছে।' সাধনা ব্যর্থ যায়নি গ্যালিলিওর। কয়েক শতাব্দী কেটে যাবার পর মানুষ তাঁর শিক্ষাকে সম্মান ও শ্রদ্ধার সাথে গ্রহণ করেছিল।

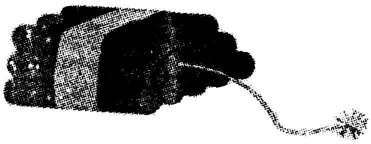

বারুদ (১৩২৮)

বারখোল্ড সোয়ার্জ

প্রথম বারুদ তৈরী করেছিল চীন দেশের লোকেরা। খ্রীষ্ট জন্মের সাড়ে চারশ বছর আগে গ্রীকরা বারুদ ব্যবহার করেছিল বলে অনুমান করা হয়। ১২৭০ সালে রোজার বেকন বারুদের কথা উল্লেখ করেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ১৩২৮ সালে বারখোল্ড সোয়ার্জই প্রথম বর্তমান দিনের বারুদকে আবিষ্কার করেন। এর কুড়ি বছর পর যুদ্ধের কাজে বারুদকে ব্যবহার করা শুরু হয়।

বারুদের উপদান হল সোরা, গন্ধক ও কাঠকয়লা। বারুদের বিস্ফোরণ ঘটে দ্রুত জারণ ক্রিয়া অর্থাৎ অক্সিজেনের সংযোগ ঘটার জন্য। বারুদে কাঠকয়লাকে গুঁড়ো করা হয় যাতে কয়লার অনুতে অক্সিজেন ঠিকমত মিশতে পারে। কয়লাকে গরম করে যাতে আপনা থেকে অক্সিজেন পাওয়া যায় এ জন্য কয়লার গুঁড়োর সাথে মেশানো হয় সোরা। কারণ সোরায় থাকে পটাসিয়াম, নাইট্রোজেন ও প্রচুর অক্সিজেন। তাপ পেলে সোরার অণু ভেঙে প্রচুর অক্সিজেন উৎপন্ন করে কয়লার গুঁড়োর সাথে বিক্রিয়া ঘটিয়ে বিস্ফোরণ ঘটায়। বিস্ফোরণ হলেই কঠিন পদার্থ বারুদ রূপান্তরিত হয় উচ্চ চাপের গ্যাসে। বন্দুক বা কামানে এই গ্যাস ধাক্কা দিয়ে ধাতব টুকরো বা ধাতব বলকে দ্রুত দূরে ঠেলে দেয়।

www.purepdfbook.com

ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে মার্টিন ওয়েজেল নামক এক বিজ্ঞানী ভূগর্ভ থেকে ধাতব আকরিক উত্তোলন করার কাজে বারুদ প্রথম ব্যবহার করেন।

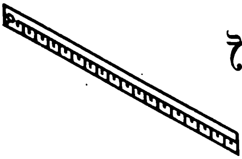

দৈর্ঘ্য মাপার একক (চতুর্দশ শতাব্দী)

ইংলণ্ডের রাজা প্রথম হেনরী

কোনো বস্তু সম্পর্কে ধারণা করা যায় তখনই যখন সেই বস্তুকে মাপা যায় এবং তাকে সংখ্যা দিয়ে প্রকাশ করা যায়। চতুর্দশ শতাব্দীতে ইংলণ্ডের রাজা প্রথম হেনরী দৈর্ঘ্য মাপার এককের প্রয়োজনীয়তা প্রথম উপলব্ধি করেন। তিনি আদেশ জারি করেন তাঁর নাকের ডগা থেকে আরম্ভ করে হাতের বুড়ো আঙুল পর্যন্ত মেপে যে দৈর্ঘ্য পাওয়া যাবে সেটাই হবে দৈর্ঘ্যের একক। এই এককের নাম দেওয়া ইয়ার্ড। বাংলায় গজ।

পঞ্চদশ শতাব্দীতে ইংলণ্ডের রাণী এলিজাবেথ দৈর্ঘ্য মাপার একক ইয়ার্ডকে বাতিল করে দিয়ে বললেন এক নির্দিষ্ট রবিবারের উপাসনা শেষ করে যখন ইংলণ্ডবাসীরা গির্জা থেকে বেরিয়ে আসবেন তখন তাদের মধ্যে ১৬ জনকে এক সারিতে দাঁড় করানো হবে। এমন ভাবে তাদের দাঁড় করানো হবে যাতে একজনের বাঁ পা তার সামনে দাঁড়ানো আরেকজনের বাঁ পা স্পর্শ করে। এভাবে যে দূরত্ব পাওয়া যায় তার নাম দেন রড। এই রডের ষোল ভাগের এক ভাগ হল ফুট। তখন থেকে ফুটকেই দৈর্ঘ্যের একক বলে ধরা হতে লাগল।

রোমানরা আবার তাদের প্রধান খাদ্যশস্য যব নিয়ে পর পর তিনটি যব সাজিয়ে যে দূরত্ব পেয়েছিলেন তার নাম দিয়েছিলেন ইঞ্চি।

প্রাচীন যুগে কাউকে ডাক দিলে যতটা দূর পর্যন্ত সেই ডাকের শব্দ পৌঁছাতে তাকে বলা হত ক্রোশ। আর ঘোড়াকে একবার গাড়িতে বেঁধে দেওয়ার পর সে যতটা পথ যেতে পারত ততটা দূরত্বকে বলা হত যোজন,

www.purepdfbook.com

কিন্তু এভাবে অঞ্চলের উপর ভিত্তি করে দৈর্ঘ্যের একক নির্ণয় করা হলে বিজ্ঞান চর্চার ক্ষেত্রে অসুবিধা হয়। তাই পৃথিবীর সর্বত্র যাতে একই দৈর্ঘ্য মাপের একক ব্যবহার করা যায় তার জন্য ফরাসীদেশের বিজ্ঞানীরা ভাবনা চিন্তা শুরু করলেন।

শেষপর্যন্ত ১৭৯৯ সালের ২২ জুন পৃথিবীর পরিধি নির্ণয় করার পর সেই পরিধির এক চতুর্থাংশের এক কোটি ভাগের এক ভাগকে দৈর্ঘ্যের একক ধরা হল। এই এককের নাম দেওয়া হল মিটার। মিটার মাপের একটি প্লাটিনাম-ইরিডিয়াম মিশ্রিত সংকর ধাতুর দণ্ড তৈরী করা হল। সেটি বর্তমানে লণ্ডন মিউজিয়ামে রাখা আছে।

পেন্সিল (১৪০০)

পেন্সিল কথাটি এসেছে ল্যাটিন শব্দ পেনসিলিয়াম থেকে। প্রাচীন যুগে লেখার জন্য ব্যবহৃত হত একটি কাঠি, তার একধারে লাগানো থাকত পশুর লেজ বা লোমের অংশ। এই লেজকে বলা হত পেনসিলিয়াম।

প্রাচীন যুগে গ্রীক ও রোমানরা লিখবার জন্য লেড বা সীসা নামের একটি ধাতু ব্যবহার করতেন। কাগজের ওপর সীসা টানলে কালো রঙের দাগ পড়ত। খ্রীষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীতে কালো চকচকে নতুন এক ধরণের পদার্থ মানুষ খুঁজে পায় অরণ্য অঞ্চলের মাটির ভিতর থেকে। এই নতুন পদার্থটি দিয়েও কালো দাগ টানা যেত। তাই মানুষ এর নাম দেয় ব্ল্যাক লেড বা কালো সীসা। পরবর্তীকালে ১৭৮৯ সালে অবশ্য এই নতুন পদার্থটির পরিচয় জানা যায়। এটি কয়লারই এক রূপভেদ। নাম গ্রাফাইট। এই গ্রাফাইট মাটির বাসনের ওপর চকচকে প্রলেপ দিতে, মরচে রোধের জন্য লোহার ওপর আস্তরণ দিতে, তাপ সহ্যকারী ধাতু গলানোর পাত্র তৈরীতে, তড়িৎ দ্বার হিসেবে কাজে লাগে।

১৪০০ সালে থেকে সীসার বদলে গ্রাফাইটকেই লেখার কাজে ব্যবহার

www.purepdfbook.com

শুরু হয়। চাহিদা কম থাকায় মানুষ তখন একটি আবরণ ছাড়া লম্বা গ্রাফাইট দণ্ড দিয়েই পেন্সিল হিসাবে কাজ চালাত। কিন্তু পরবর্তী কালে পেন্সিলের সংস্কার করার প্রয়োজন হল।

গ্রাফাইটের মিহি গুঁড়োর সাথে সালফার বা গন্ধক মিশিয়ে সরু ও লম্বা শিষ প্রথম তৈরী করেছিলেন জার্মানীর নুরেনবার্গ অঞ্চলের একটি ব্যবসায়িক সংস্থা। এরপর ১৭৯৫ সালে নেপোলিয়ানের অনুরোধে ও আর্থিক সাহায্যে এক ফরাসী কারিগর নিকোলাস জ্যাক্স কোঁতে গ্রাফাইটের মিহি গুঁড়োর সাথে এক জাতীয় কাদা মিশিয়ে দণ্ড তৈরী করে তাকে শক্ত করার জন্য পুড়িয়ে নিয়ে তৈরী করলেন পেন্সিলের শিষ। এতে লেখার দাগ আরো কালো হল।

ভিয়েনার বিজ্ঞানী হার্টমুখ এই কাদা ও গ্রাফাইট গুঁড়োর পরিমাণ বাড়িয়ে কমিয়ে হার্ড পেন্সিল ও সফ্ট পেন্সিল তৈরী করলেন।

১৮১২ সালে আমেরিকান কারিগর উইলিয়াম মনরো পেন্সিলের শিষ যাতে সহজে না ভেঙে যায় সেজন্য শিষকে আঠা দিয়ে কাঠের আবরণের সাথে লাগিয়ে দিয়েছিলেন। এতে পেন্সিল যেমন সুদৃশ্য হল তেমনি আঁকা বা লেখার কাজও সহজ হয়েছিল।

মুদ্রণ যন্ত্র (১৪৫৫)

জোহান গুটেনবার্গ (১৩৯৭—১৪৬৮)

জার্মানীতে খোদাইকার ও শিল্পী হিসেবে নাম ছিল জোহান গুটেনবার্গের। তিনি তাঁর স্ত্রী এনার সাথে অবসর সময়ে তাস খেলতেন। সে সময় মোটা

www.purepdfbook.com

চার কোনা কাগজের ওপর রঙ দিয়ে এঁকে শিল্পীরা তাস তৈরী করত। একদিন হঠাৎ গুটেনবার্গের মনে হল কিভাবে সহজে অনেক তাস তৈরী করা যায় তা ভাবা দরকার। ভাবতে ভাবতে তিনি কাগজের ওপর ছাপ তোলার কথা ভেবে কাঠের টুকরোয় তাসের ছবি খোদাই করলেন এবং কালি মাখিয়ে কাগজের ওপর তাসের ছবিও তুলে ফেললেন। বাণ্ডিল বাণ্ডিল তাস তৈরী হতে লাগল। দীর্ঘদিন ছাপ তুলতে তুলতে তিনি বুঝলেন আপেল গাছের কাঠে খোদাই করলে ছাঁচ ভাল থাকে এবং ভুসোকালি, তার্পিন ও তিসির তেলের কালি ব্যবহার করলে সুবিধা হয়।

এভাবে তিনি বড় বড় ছবিরও ছাপ তুলে বিক্রি করতে লাগলেন। গুটেনবার্গের ছাপ তোলার কথা চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়তে লাগল। জন্মস্থান মায়ন্টসে তিনি একটি ছাপাখানাও খুলেছিলেন। এক পাদ্রী ভাবলেন এ ভাবে তো তাহলে বই-এর অক্ষরকেও ছাপানো যায়। একথা গুটেনবার্গকে বলতেই তিনি একটু ভাবনায় পড়ে গেলেন। তারপর অনেক ভাবনার পর কাঠ দিয়ে অক্ষরের ছাঁচ তৈরী করে ফেললেন। কিন্তু ছাঁচগুলো সাজালে হাত থেকে পড়ে ভেঙে যাবার সম্ভাবনা থাকে। তাই একটি কাঠের ফলকে একটার পর একটা ছাঁচগুলি সাজালেন এবং এভাবে পাঁচ বছর পরিশ্রম করে ১৪৫৫ সালে পৃথিবীর প্রথম ছাপা বই 'ম্যাজারিন বাইবেল' ছাপালেন। এর প্রতিপাতায় ৪২ টি লাইন ছিল। কাঠের অক্ষর কালিতে নরম হয়ে সহজেই ভেঙে যায় বলে তিনি তাঁর এক বন্ধুকে দিয়ে সীসা, টিন ও অ্যান্টিমনির সংকর ধাতুর অক্ষরও তৈরী করেছিলেন।

www.purepdfbook.com

দোলকের দোলন কাল (১৫৮২)

গ্যালিলিও গ্যালিলি (১৫৬৪—১৬৪২)

প্রায় চারশো বছর আগেকার কথা। ১৫৮২ সাল। আঠারো বছরের গ্যালিলিও গ্যালিলি গেছেন ইটালীর পিসা শহরের এক প্রার্থনা সভায়। প্রার্থনা সভা শেষ হয়ে সবাই যে যার বাড়ী চলে গেছে। গ্যালিলিও কিন্তু বসে আছেন তখনো।

তখনকার দিনে তো আর ইলেকট্রিক বাল্ব ছিল না তাই তেলের প্রদীপ বা মোমবাতির আলোতেই কাজ করতে হত। গির্জার ভেতরেও ছাদের কড়িকাঠ থেকে শেকল দিয়ে ঝাড়লণ্ঠন ঝোলানো থাকত। চুপ করে বসে থাকতে থাকতে হঠাৎ গ্যালিলিও লক্ষ্য করলেন জানলা দিয়ে যেই দমকা বাতাস আসছে অমনি শেকলে ঝোলানো ঝাড়লণ্ঠনটা দুলতে শুরু করছে, তিনি দেখলেন ঝাড়টা দুলে একটা নির্দিষ্ট দূরত্বে গিয়ে আবার বিপরীত দিকে ফিরে যাচ্ছে এবং সেখানেও থেমে যাচ্ছে না। একটা নির্দিষ্ট দূরত্বে পৌঁছে আবার ফিরে আসছে। বাতাস যেই কমে আসছে এই দোলনের বিস্তারও ক্রমশঃ ছোট হতে হতে এক সময় থেমে যাচ্ছে।

গ্যালিলিওর মনে হল ঐ দোলনের বিস্তারের মধ্যে একটা সমতা আছে। তাঁর ধারণাটা সঠিক কিনা জানার জন্য তিনি নিজের হাতের নাড়ি টিপে দেখলেন প্রতিটি দোলন সম্পন্ন হতে একই সংখ্যক নাড়ী স্পন্দন হচ্ছে। বাড়ীতে ফিরে এসে তিনি অনেকগুলি ছোট বড় সীসের বল এনে সুতোয় বেঁধে দুলিয়ে নাড়ী টিপে গুনতে লাগলেন। বার বার গোনার পর তিনি সিদ্ধান্তে এলেন সুতোর দৈর্ঘ্যের ওপরই দোলন কাল নির্ভর করে। বস্তুটির

 www.purepdfbook.com

ওজনের ওপর নয়। এই ঘটনার থেকেই তিনি আবিষ্কার করলেন দোলকের সূত্র।

গ্যালিলিওর জন্ম হয় ১৫৬৪ খ্রীষ্টাব্দের ১৫ ফেব্রুয়ারী ইতালির পিসা শহরের এক বনেদী দরিদ্র পরিবারে। তাঁর বাবা ভিন্সেঞ্জিও গ্যালিলি ছিলেন গণিতজ্ঞ ও সঙ্গীতজ্ঞ। গণিত চর্চার শুরু তাঁর বাবার কাছ থেকেই। বারো বছর বয়সে তিনি ভর্তি হয়েছিলেন এক জেসুইট মঠের স্কুলে। ১৫৮১ খ্রীষ্টাব্দে তিনি পিসা বিশ্ববিদ্যালয়ে চিকিৎসাবিদ্যা শেখার জন্য ভর্তি হন। চিকিৎসা বিদ্যার থেকেও তাঁর আগ্রহ ছিল ইউক্লিড আর আর্কিমিডিসের গণিত বিষয়ক বইগুলি ও জ্যোর্তিবিজ্ঞানের ওপর।

১৫৮৯ খ্রীষ্টাব্দে পঁচিশ বছর বয়সে তিনি তিন বছরের জন্য পিসা বিশ্ববিদ্যালয়ে গণিতের অধ্যাপনা করেন। সেখানে তিনি লাতিন ভাষার বদলে মাতৃভাষাতেই ছাত্রদের পড়াতেন। তাঁর এই আচরণ অন্যান্য অধ্যাপকদের অপছন্দ ছিল। ফলে তিনি পিসা ছেড়ে পাদুয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনার কাজ নিয়ে চলে আসেন। এই পিসা বিশ্ববিদ্যালয়ে থাকার সময়ই তিনি ১৫৯১ খ্রীষ্টাব্দে পিসার আনত মিনারের ওপর থেকে একশ পাউণ্ড ও এক পাউণ্ড ওজনের দুটো বল এক সাথে মাটিতে ফেলে অ্যারিস্টটলের তথ্যকে ভুল বলে প্রমাণিত করেন।

গ্যালিলিও বলবিদ্যা সম্পর্কিত বহু গবেষণা ও বিভিন্ন ভরের পতনশীল বস্তুর বেগ সংক্রান্ত তিনটি সূত্র আবিষ্কার করে গতিবিদ্যার জনক হিসাবে খ্যাতি লাভ করেছিলেন।

www.purepdfbook.com

স্থির তড়িৎ (১৬০০ খ্রীঃ)

স্যার উইলিয়াম গিলবার্ট (১৫৪০-১৬০৩)

আকাশের বিদ্যুৎ চমকানি দেখে মানুষ এক সময় ভয় পেত। কিন্তু বিদ্যুৎ যে আছে এই কথাই মানুষ এক সময় জানত না। ৬০০ খ্রীষ্ট পূর্বাব্দে প্রাচীন গ্রীসের মিলেটাস নামক স্থানে থ্যালেস নামক এক প্রখ্যাত দার্শনিক ও গণিতজ্ঞ একদিন এক অদ্ভুত বিষয় আবিষ্কার করলেন।

তখনকার দিনে অ্যাম্বার নামক এক তৈল স্ফটিক সুন্দর বর্ণবিন্যাস ও ঔজ্জ্বল্যের জন্য দামী পাথরের মর্যাদা পেত। এই অ্যাম্বার হল মাটি চাপা পড়ে ফসিল হয়ে যাওয়া পাইন গাছের আঠা বা রজন। থ্যালেস একদিন একটা অ্যাম্বারের টুকরো চক্‌চকে করে তোলার জন্য রেশমী কাপড় দিয়ে খানিকটা ঘষে রাখলেন। হঠাৎ দেখলেন টুকরোটি হাল্কা জিনিস—যেমন কাগজ, পালক বা কাপড়ের টুকরোকে টানছে। তার তখন ধারণা হল হয়ত আকাশের যে বিদ্যুতের শক্তি মাটির পৃথিবীতেও থাকতে পারে।

এরপর ১৬০০ সালে ইংলণ্ডের রাণী এলিজাবেথ এর ব্যক্তিগত চিকিৎসক উইলিয়াম গিলবার্ট অ্যাম্বার এবং আরো নানা জিনিসকে ঘষে গবেষণা করতে লাগলেন। গবেষণার ফলে তিনি দেখতে পেলেন অ্যাম্বার ছাড়াও গন্ধক, কাচ, গালা প্রভৃতিকে সিল্ক, ফ্লানেল বা পশু লোম দিয়ে ঘষলে তা হাল্কা জিনিসকে আকর্ষণ করে। অ্যাম্বারকে গ্রীক ভাষায় বলে ইলেক্‌ট্রন, তাই এই আকর্ষণী শক্তির নাম তিনি দিলেন ইলেকট্রিসিটি বা তড়িৎ। এই আকর্ষণ করার কারণ হিসেবে তিনি বললেন যে রেশমী কাপড় দিয়ে অ্যাম্বার, গন্ধক, কাঠ বা গালাকে ঘষলে দুটি বস্তুর ঘর্ষণে ঘর্ষ বিদ্যুৎ তৈরী হওয়ায় অ্যাম্বার, গন্ধক, কাচ বা গালা তড়িতাহত হয় তাই হাল্কা জিনিষকে আকর্ষণ করে। এই তড়িৎ ঘর্ষিত বস্তুতেই আবদ্ধ থাকে, চলাচল করতে পারে না বলে গিলবার্ট এর নাম দিলেন স্থির তড়িৎ।

ষোড়শ শতাব্দীতে গিলবার্টের কাজের অনুপ্রেরণায় ইউরোপের বিজ্ঞানীরা

 www.purepdfbook.com

বিদ্যুৎ তৈরী করার যন্ত্র লিডেনজার ও বিদ্যুৎ ধরে রাখবার আধার উইমস্হাস্ট মেশিন আবিষ্কার করেন। বেশী পরিমাণে বিদ্যুৎ সঞ্চয় করলে বিদ্যুৎ শূন্যস্থান পেরিয়ে গিয়ে স্ফুলিঙ্গ সৃষ্টি করত। বিদ্যুৎ আধারে বিদ্যুৎ সঞ্চিত হলেও তার নিয়ন্ত্রিত প্রবাহ সম্ভব ছিল না।

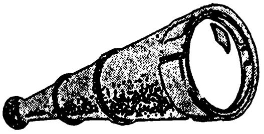

দূরবীণ (১৬০৯)

গ্যালিলিও (১৫৬৪—১৬৪২)

১৬০৮ সালে লিপারসে নামের ইংলণ্ডের এক চশমা বিক্রেতা ধাতু নির্মিত একটি চোঙের আগায় একটি লেন্স বসিয়ে দূরবীণের মত একটি যন্ত্র তৈরী করেছিলেন। এই যন্ত্র দিয়ে অল্প দূরের কোনো বস্তুকে বড় ভাবে দেখা যেত। যন্ত্রটিকে সকলে খেলনা হিসাবেই গ্রহণ করেছিল।

১৬০৮ সালে গ্যালিলিও এসেছিলেন ভেনিসে। কোপার্নিকাসের মত সমর্থন করে তিনি তখন চর্তুদিকে হৈ চৈ ফেলে দিয়েছেন। এসময় তাঁর কানে গেল লিপারসের যন্ত্রটির কথা। তিনি ভাবলেন তাহলে তো এভাবে দূরের অনেক জিনিস সম্বন্ধে আমরা অনেক তথ্য জানতে পারব। এই ভাবনা থেকেই তিনি ১৬০৯ সালে ধাতব চোঙের দুদিকে ছোট ও বড় দুধরণের লেন্স বসিয়ে তৈরী করে ফেললেন দূরবীণ। দূরবীণ নিয়ে তিনি আকাশ পর্যবেক্ষণ করে দূরবীণভিত্তিক জ্যোর্তিবিজ্ঞানের সূত্রপাত করেন। বৃহস্পতির চারটি উপগ্রহ, শনিগ্রহের বলয়, শুক্র গ্রহের কলা এসব আবিষ্কার করেছিলেন তিনি এই দূরবীণ দিয়েই।

গ্যালিলিয়ান টেলিস্কোপের নানা উন্নতি হয়ে তৈরী হয়েছে বর্তমান যুগের দূরবীণ। বর্তমান যুগের দূরবীণ দু ধরনের। একটি প্রতিসরিত আলোর দূরবীণ, অন্যটি প্রতিফলিত আলোর দূরবীণ। দূরবীণে ব্যবহৃত লেন্স দুধরণের, একটি উত্তল অন্যটি অবতল। উত্তল লেন্সের মাঝখানটা মোটা, কিনারার দিক পাতলা আর অবতল লেন্সে ঠিক উল্টো হয়।

www.purepdfbook.com

প্রতিসরিত আলোর দূরবীণে একটি ধাতু নির্মিত চোঙের বড় মুখে থাকে বড় উত্তল লেন্স। এটি লক্ষ্য বস্তুর দিকে মুখ করে রাখা হয় তাই এই লেন্সটিকে বলে অবজেক্ট গ্লাস।

চোঙের ছোট মুখে থাকে ছোট উত্তল লেন্স। এটিতে চোখ রেখে দেখা হয় বলে এর নাম আইপিস। বড় ও ছোট লেন্স দুটিকে এমন ভাবে রাখা হয় যাতে উভয়ের ফোকাস এক বিন্দুতে মিলিত হয় ও অক্ষদুটো একই সমতলে থাকে। এই দূরবীণের লেন্সে আলোর প্রতিসরণ ঘটে বলে প্রতিসারিত আলোর দূরবীণ নাম দেওয়া হয়েছে। আমাদের চোখে যতটা আলো পড়ে অবজেক্ট গ্লাসে তার চেয়ে অনেক বেশী আলো পড়ে তাই আকাশের গ্রহদের বড় ও নক্ষত্রদের আরো উজ্জ্বল দেখায়।

প্রতিফলিত আলোর দূরবীণে ধাতব নলে অবতল লেন্স লাগানো হয়। এক পিঠ সমতল অপর পিঠ অবতল কাচ খণ্ডের অবতল পিঠে রূপা বা অ্যালুমিনিয়ামের প্রলেপ লাগিয়ে অবতল দর্পণ তৈরী করা হয়।প্রতিফলিত আলোর দূরবীণে নক্ষত্রের আলোকরশ্মি অবতল দর্পণে এসে পড়ে সমস্ত রশ্মি এক সাথে প্রতিফলিত হয়ে দর্পণের ফোকাস বিন্দুতে জড়ো হয়। এভাবে একটি বিন্দুতে সব রশ্মি জড়ো হওয়ায় দুর্বল রশ্মিও জোড়ালো হয়ে যায়, ফলে গ্রহগুলিকে বড় ও নক্ষত্রগুলিকে উজ্জ্বল দেখায়। বর্তমান যুগে প্রতিফলিত আলোর দূরবীণকে অবলম্বন করে তীক্ষ্ণঅনুভূতি সম্পন্ন একটি অবতল আকাশতার ও বেতার গ্রাহক যন্ত্র ব্যবহার করে বেতার দূরবীক্ষণ যন্ত্র তৈরী করা হয়েছে। এই যন্ত্রে মহাকাশ থেকে আসা বেতার তরঙ্গ ধরা পড়ে।

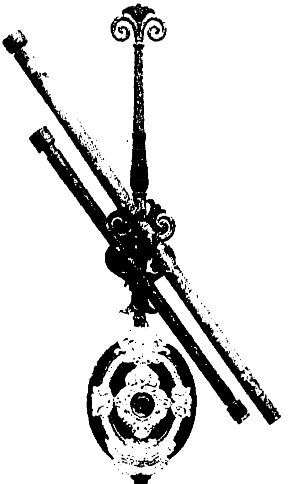

গ্যালিলিও আবিষ্কৃত দুটি দূরবীণ

www.purepdfbook.com

জীবদেহে রক্ত সঞ্চালন প্রক্রিয়া (১৬২৮)

উইলিয়াম হার্ভে (১৫৭৮-১৬৫৭)

প্রাচীন যুগে শব দেহকে পবিত্র বলে মনে করা হত বলে শব ব্যবচ্ছেদ করে দেহের বিভিন্ন অংশের গঠন সম্পর্কে ধারণা যেত না। চিত্রকর লিওনার্দো দ্য ভিঞ্চিই প্রথম দেহতন্ত্র সম্পর্কে উন্নত বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় দেন এবং আন্দ্রিয়াস ভেসেলিয়াস শব ব্যবচ্ছেদ করে দেহতন্ত্রের সঠিক স্থান নির্ণয় করেন।

দেহের গঠন কৌশল কিছুটা জানা হলেও হৃদযন্ত্রের কাজ ও রক্তসংবহন তন্ত্র সম্পর্কে মানুষের কোনো ধারণা ছিল না। ১৫৯৭ সালে উইলিয়ম হার্ভে যখন কেম্‌ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক হয়ে ইটালীর পাদুয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে শারীর বিদ্যা পড়তে আসেন, তখন সেখানে অধ্যাপনা করতেন বিজ্ঞানী ফ্যাব্রিয়াস। তিনি কয়েকবছর আগে আবিষ্কার করেছিলেন শিরার মধ্যে একধরণের ভালব আছে, কিন্তু তার কাজ কি সে সম্পর্কে কোনো ধারণা তিনি দিতে পারেননি।

১৬০২ সালে হার্ভে ডাক্তারী পাশ করে ১৭০৭ সালে কেমব্রিজে অধ্যাপনা শুরু করেন ও লণ্ডনে চিকিৎসা কেন্দ্র খুলে বসেন। তখন থেকেই তিনি পাখী, ব্যাঙ, ইঁদুর প্রভৃতি প্রাণীর দেহ ব্যবচ্ছেদ করে রক্তনালী পরীক্ষা করতে থাকেন। এভাবে পরীক্ষার ফলে তিনি ১৬২৮ সালে আবিষ্কার করেন শিরাতে যে ভাল্‌ব আছে সেগুলি হৃদযন্ত্রে থেকে বাইরে যাবার দিকে খোলা। ফলে তিনি বুঝলেন হৃদযন্ত্র হল একটি ফাঁপা মাংসপেশী, যা রক্তকে পাম্প করে, আর শিরার রক্ত সবসময় হৃদযন্ত্রের দিকে যায় এবং ধমনীর রক্ত সবসময় হৃদযন্ত্র থেকে বেরিয়ে আসে। হৃদযন্ত্র সংকুচিত হলে প্রায় দুই

www.purepdfbook.com

আউন্স রক্ত বেরিয়ে আসে তারপর হৃদযন্ত্র প্রসারিত হলেই শিরা বেয়ে রক্ত হৃদযন্ত্রে প্রবেশ করে। এভাবে হৃদযন্ত্র সংকোচন প্রসারণের মাধ্যমে পাম্পের কাজ করে। তিনি নাড়ী টিপে ধরে প্রতিমিনিটে নাড়ীর স্পন্দন কত হচ্ছে তা গুণে হৃদযন্ত্রের স্পন্দন নির্ণয় করেন এবং এই পদ্ধতিটি রোগ নির্ণয়ের ক্ষেত্রে কাজে লাগান। তিনি দেখেছিলেন পূর্ণবয়স্ক মানুষের স্বাভাবিক হৃদস্পন্দন মিনিটে ৬০ থেকে ৯০ বার হয়। এবং হৃদযন্ত্র প্রতিঘণ্টায় ৬৫ গ্যালনের মত রক্তকে পাম্প করতে পারে, এত রক্ত অবশ্য আমাদের শরীরে থাকে না। চার বা পাঁচ কোয়ার্ট রক্তই চক্রাকারে আবর্তিত হয়।

হার্ভে প্রমাণ করেন হৃদযন্ত্র পাম্প করে ধমনীর মধ্য দিয়ে দেহের বিভিন্ন অংশে রক্ত পাঠায় আবার ধমনীর বিভিন্ন শাখায় প্রশাখায় বিভক্ত হয়ে ছোট ছোট কৌশিক নালীর সৃষ্টি করে। দূষিত রক্ত শিরা বাহিত হয়ে আবার হৃৎপিণ্ডে ফিরে আসে।

হার্ভে 'ট্রিটিজ অন দি মোশন অফ দি হার্ট অ্যাণ্ড ব্লাড' নামের একটি বই লেখেন। এই বইয়ের মাধ্যমে চিকিৎসা বিজ্ঞানে বহু উন্নতি ঘটেছে।

ব্যারোমিটার (১৬৪০)

টরিসেলি

টস্কনির ডিউক একবার ৩৪ ফুটেরও বেশী গভীর একটি কুয়ো খুঁড়িয়ে তার থেকে জল তোলার জন্য একটি পাম্প লাগালেন। কিন্তু পাম্প দিয়ে কিছুতেই জল তোলা গেল না। ডিউক ভেবে পেলেন না এর কারণটা কি। শেষপর্যন্ত তিনি কারণ সন্ধানে গেলেন বিখ্যাত বিজ্ঞানী গ্যালিলিওর কাছে। কিন্তু গ্যালিলিও তখন অন্ধ হয়ে গেছেন। তার ওপর নানান মানসিক আঘাতে ও বয়সের ভারে তিনি জর্জরিত । এজন্য গ্যালিলিও তাঁর প্রিয় শিষ্য টরিসেলিকে এই কারণ অনুসন্ধানের দায়িত্ব দিলেন।

www.purepdfbook.com

টরিসেলি কুয়ো দেখে তার গভীরতা মেপে দেখলেন। তিনি ভাবতে লাগলেন কেন ৩৪ ফুটের বেশী গভীরতা থেকে জল তোলা যাচ্ছে না? এক সময় তাঁর মনে হল হয়ত বায়ুর চাপের জন্যই এটা হচ্ছে। পাম্পটা দেখে তিনি ভাবলেন ঐ লম্বা নলে ৩৪ ফুট জল উঠছে তা সম্ভব হচ্ছে অপরদিকে বায়ু চাপ দিচ্ছে বলেই। এই ধারণাটা সঠিক কিনা তা প্রমাণ করার জন্য তিনি একটি এক মিটার লম্বা একমুখ খোলা কাচের নল নিয়ে সেটাকে ভর্তি করলেন জলের চেয়ে সাড়ে তের গুণ ভারী তরল পারদ দিয়ে। তারপর ঐ নলটিকে একটি পারদভর্তি পাত্রে খাড়া ভাবে উপুড় করে রাখলেন। দেখলেন নলের ভেতরের পারা ধীরে ধীরে নেমে ৭৬ সেন্টিমিটারে একেবারে স্থির হয়ে গেল। টরিসেলি এর থেকে বুঝতে পারলেন বায়ুমণ্ডল পৃথিবীর উপর যে চাপ দিচ্ছে সেই চাপ ছিয়াত্তর সেন্টিমিটার পারদ স্তম্ভকে ধরে রাখতে পারে। অর্থাৎ পারদ জলের চেয়ে যেহেতু সাড়ে তেরো গুণ ভারী তাই পৃথিবীর ওপর বায়ু যে চাপ দিচ্ছে তাতে ১৩.৬ × ৭৬ = ৩৪ ফুটের বেশী উঁচুতে জল তুলতে পারে না।

এই ঘটনার মাধ্যমে তিনি ১৬৪০ সালে বায়ুর চাপ মাপার যন্ত্র আবিষ্কার করে ফেললেন। নাম দিলেন ব্যারোমিটার। পৃথিবীর ওপর বায়ুর এই চাপ সর্বত্র সমান থাকে না, পাহাড়ের ওপর ও খনি গর্ভে চাপের তারতম্য ঘটে। বায়ুর চাপ কমলে ব্যারোমিটারের পারার উচ্চতা নামবে এবং বায়ুর চাপ বাড়লে পারার উচ্চতা উঠবে।

সূর্য রশ্মির বর্ণ বিশ্লেষণ (১৬৬৪)

স্যার আইজ্যাক নিউটন (১৬৪২—১৭২৭)

ইংলণ্ডের এক বৃদ্ধা একদিন তাঁর বাড়ীর জানলা দিয়ে দেখতে পেলেন তাঁর পাশের বাড়ীর আত্মভোলা দার্শনিক লোকটি সারাদিন ধরে কেবলই বুদ্বুদ ওড়াচ্ছেন আর কি যেন লক্ষ্য করছেন, দু চার দিন কেবল একই কাজ

www.purepdfbook.com

করে চললেন লোকটি। বৃদ্ধা ভাবলেন বইমুখো লোকটি কি পাগল হয়ে গেল? নইলে কাজকর্ম ফেলে কেবল বুদ্বুদ ওড়ায় কেন?

বৃদ্ধার জানা ছিল না লোকটির প্রকৃত পরিচয়। তাই পাগল ভেবে তিনি থানায় খবর দিতে চললেন। পুলিশ এল সঙ্গে সঙ্গেই। কিন্তু ধরবেন কাকে! লোকটি আর কেউ নন, বিখ্যাত বিজ্ঞানী স্যার আইজ্যাক নিউটন।

বুদ্বুদের গায়ে বা কাচের ঝাড়ে সূর্যের আলো পড়ে যে রামধনুর মত জমকালো রঙ দেখা যায় তার কারণ কি সেটাই খুঁজে বের করেছিলেন। তিনিই ১৬৬৪ সালে প্রমাণ করেন যে সূর্যের আলোয় সাতটি রঙ মিশে আছে। তাই আকাশের ভাসমান জলকণার মধ্যে সূর্যরশ্মি প্রবেশ করে সম্পূর্ণ আভ্যন্তরীন প্রতিফলন ঘটিয়ে রামধনুর সৃষ্টি হয়।

সূর্যরশ্মিকে বিশ্লেষণ করার জন্য পরবর্তীকালে তৈরী হয়েছে বর্ণালী বীক্ষণ যন্ত্র। এই যন্ত্রে কলিমেটর টিউব নামে ধাতুর সোজা একটি চোঙ থাকে, তার এক মুখ দুটি অর্ধচন্দ্রাকৃতি অস্বচ্ছ কোনো ধাতব পাত্রের ঢাকনি দিয়ে ঢাকা থাকে। দুটি ঢাকনির মাঝখানে থাকে একটি সরু ফুটো। টিউবের অন্যমুখে থাকে একটি উত্তল লেন্স। সরু ফুটোটা উত্তল লেন্সের ফোকাসের সোজাসুজি রাখা হয়। লেন্স লাগানো মুখটির সামনে রাখা হয় একটি প্রিজম, এই প্রিজম সাধারণ বর্ণালী বীক্ষণ যন্ত্রেতে হয় কাচের। অতিবেগুনী রশ্মি বিশ্লেষণ যন্ত্রেতে হয় কোয়ার্টাজের। প্রিজমের অপর দিকে থাকে একটি দূরবীণ। পুরো যন্ত্রটি একটি কাঠের বা ধাতুর পাটাতনের ওপর পর পর রাখা থাকে। প্রিজমের দুই পিঠে আলোক রশ্মি প্রতিসরিত হয় বলে টিউবের ফুটো দিয়ে আসা আলো বিশ্লিষ্ট হয়ে বর্ণালীর সৃষ্টি করে এবং দূরবীণের মাধ্যমে প্রতি রঙের জন্য একটি সরু ফাঁকের প্রতিচ্ছবি পর পর থাকতে দেখা যায়।

বর্ণবীক্ষণ যন্ত্রে সূর্যের রশ্মিকে বিশ্লেষণ করে সূর্য পৃষ্ঠের তাপ এবং সূর্যের গঠন উপাদান জানা যায়। অন্যান্য তারাদের আলোকে বিশ্লেষণ করে তাদের গঠন উপাদানও জানা যায়। বর্ণালী বীক্ষণ দিয়ে রাসায়নিক পদার্থকে বিশ্লেষণ করার পদ্ধতি বের করেন কারসফ ও বুনেসন নামক দুই বিজ্ঞানী।

জ্যোর্তিবিজ্ঞান, পরমাণুবিজ্ঞান মহাকাশের খবর সংগ্রহের ক্ষেত্রে বর্তমানে বর্ণালী বিদ্যাকে ব্যবহার করা হচ্ছে।

www.purepdfbook.com

মাধ্যাকর্ষণ শক্তি (১৬৬৫)

স্যার আইজ্যাক নিউটন (১৬৪২—১৭২৭)

গ্যালিলিও যে বছর মারা গেলেন সে বছরই জন্ম হল এক বিশ্ববিখ্যাত বিজ্ঞানীর। তিনি হলেন স্যার আইজাক নিউটন। চেহারা রুগ্ন প্রকৃতির হলেও নিউটনের প্রতিভা ছিল অসাধারণ। ছোটবেলা তিনি একটি কারুকার্যময় ঘড়ি আর একটা গম পেষাই কল বানিয়ে সবাইকে তাক্ লাগিয়ে দিয়েছিলেন। অঙ্কে তাঁর অগাধ জ্ঞান ছিল। পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ শক্তি আছে। সেটি তিনিই প্রথম প্রমাণ করে দেখান। এ সম্পর্কে একটি গল্প আছে।

নিউটন একদিন বসে আছেন তাঁদের উলস্‌থর্প এর বাড়ীর বাগানে। হঠাৎ বাগানের আপেল গাছ থেকে একটি আপেল ঝুপ করে খসে পড়ল মাটিতে। ২৩ বছরের যুবক নিউটনের মনে হল আপেলটা উপরের দিকে না গিয়ে মাটিতেই পড়ল কেন? এমনকি ঐ আপেলটাকে যদি উপরের দিকে অনেক ছুঁড়ে দেওয়া হয় তবুও সেটা মাটিতেই এসে পড়ে। এটা কেন হয়? এই কেনর উত্তর খুঁজতে গিয়েই তিনি মাধ্যাকর্ষণ বল আবিষ্কার করলেন।

পৃথিবীর একটি নিজস্ব আকর্ষণ বল আছে। যাকে সহজে পেরিয়ে যাওয়া যায় না। এই আকর্ষণের কারণেই চাঁদ পৃথিবীর চারদিকে ঘোরে। এই আকর্ষণ বলেরই তিনি নাম দেন মাধ্যাকর্ষণ বা অভিকর্ষ। তিনি আরো বলেছিলেন শুধু পৃথিবীই নয় বিশ্বের প্রতিটি বস্তু, ধূলিকণা, গ্রহ-উপগ্রহ, নক্ষত্র প্রত্যেকেই প্রত্যেককে আকর্ষণ করছে। এই আকর্ষণের জন্যই নক্ষত্রের চারিদিকে ঘুরছে গ্রহরা, গ্রহর চারদিকে ঘুরছে উপগ্রহরা, কখনই ছিটকে বেরিয়ে যেতে পারছে না।

১৬৬৯ সালে নিউটন মাত্র ২৭ বছর বয়সে ক্যালকুলাস তত্ত্ব আবিষ্কার করলেন।

www.purepdfbook.com

নিউটন ১৬৮৭ সালে প্রিন্সিপিয়া ম্যাথামেটিকা নামক একটি বিজ্ঞানের বই লিখেছিলেন। এই প্রিন্সিপিয়া গ্রন্থের মাধ্যমেই তাঁর নাম ছড়িয়ে পড়ে সারা পৃথিবীতে।

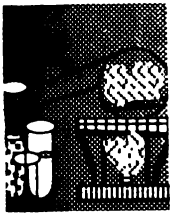

ফসফরাস (১৬৬৯)

হেনিং ব্রাণ্ড

মিশর দেশকে আরবী ভাষায় বলা হত অলকিমিয়া বা কালো মাটির দেশ। প্রাচীনকালে মিশরের মানুষ ধাতু নিয়ে যে গবেষণা করত তার নাম অ্যালকেমি বা কিমিয়া বিদ্যা। যারা এই বিদ্যাচর্চা করতেন তাঁরা ছিলেন অ্যালকেমিস্ট। এই অ্যালকেমিস্টরাই একসময় কোনো এক যৌগিক থেকে ফসফরাসকে নিষ্কাশন করার পদ্ধতি বের করেছিলেন। কিন্তু সে পদ্ধতি গোপনই ছিল।

ফসফরাসকে মৌলিক পদার্থ হিসাবে প্রকৃতিতে পাওয়া যায় না কারণ ফসফরাস খুব সহজে বায়ুতে জারিত হয়ে যায়।

১৬৬৯ সালে হামবুর্গের বিজ্ঞানী হেনিং ব্রাণ্ড মানুষের মূত্র নিয়ে গবেষণা করছিলেন। একদিন তিনি মূত্রের জলীয় অংশকে বাষ্পীভূত করে গাঢ় তরলে পরিণত করলেন। এবার সেই গাঢ় তরলকে বালি ও কাঠকয়লা দিয়ে পুড়িয়ে পাতিত করে পেলেন লাল রঙের এক তরল পদার্থ। এই পদার্থটিকেও পাতন করে তিনি বক যন্ত্রের তলায় কালো রঙের একটি পদার্থের অধঃক্ষেপ পেলেন, এ সময় তিনি বক যন্ত্রের গায়ে সাদা রঙের আলোক বিকিরণ ক্ষমতাসম্পন্ন একটি পদার্থকে জমা হতে দেখেন। তিনি অনুপ্রভাসৃষ্টিকারী অর্থাৎ ফসফোরেসেন্স ক্ষমতাযুক্ত এই পদার্থটির নাম দেন ফসফরাস। রসায়ন বিজ্ঞানে ঐ মৌলিক পদার্থটি চিহ্নিত হয় 'পি' অক্ষরে।

হেনিং ব্রাণ্ডের পর ১৭৭১ সালে বিজ্ঞানী গ্যান প্রাণীর অস্থি থেকে

www.purepdfbook.com

ফসফরাস নিষ্কাশন করেন। জানা যায় প্রাণীর অস্থির প্রধান উপাদান হল ফসফরাস। জীবদেহের মাংসপেশী, জীবকোষ, স্নায়ু অস্থিমজ্জা, মস্তিষ্ক সবকিছুতেই ফসফরাস থাকে।

হেনিং ব্রাণ্ড মনে করেছিলেন ফসফরাস বুঝি কেবলমাত্র সাদা রঙেরই হয়। কিন্তু ১৮৩৭ সালে স্রোইটের নামের এক বিজ্ঞানী বাতাসের অনুপস্থিতিতে সাদা ফসফরাসকে ৩০০ ডিগ্রি সেলসিয়াস উষ্ণতায় উত্তপ্ত করে লাল ফসফরাস পান। পরীক্ষা করে দেখা যায় এটি বাতাসে দাহ্য নয়। ১৯৩৪ সালে পি ব্রিজম্যান নামক বিজ্ঞানী উচ্চচাপে ফসফরাসকে উত্তপ্ত করে কালো রঙের ফসফরাস তৈরী করেন। অর্থাৎ মৌলিক পদার্থ রূপে ফসফরাসকে সাদা, লাল, কালো তিন রঙে পাওয়া যায়।

মৌলিক পদার্থ রূপে ফসফরাস অত্যন্ত বিষাক্ত। সাদা ফসফরাস সবচেয়ে বেশী বিষাক্ত। ফসফরাস ঘটিত খাদ্য আমাদের দেহে প্রয়োজনীয়, ডিমের কুসুম, মাংসের হাড় ও মজ্জায় এবং সামুদ্রিক মাছে প্রচুর ফসফরাস থাকে।

সমুদ্রের জলে ফসফরাস থাকে বলে রাতের সমুদ্রের ঢেউ ঝকমক করে। জোনাকির দেহে ফসফরাসের যৌগ লুসিফেরিন থাকার জন্য রাত্রে জোনাকির গা থেকে নীলাভ আলো বিকিরিত হয়।

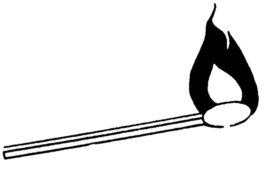

দেশলাই (১৬৮০)

হাউক উইৎস

প্রাগৈতিহাসিক যুগে আদিম মানুষ দুটি শুকনো কাঠ ঘষে আগুন জ্বালাতো, তারপর এল চক্‌মকি পাথর। হাজার হাজার বছর ধরে চক্‌মকি পাথর দিয়ে আগুন জ্বালাবার রীতি ব্যবহৃত হয়ে আসছিল। কিন্তু চক্‌মকি পাথর তো শুধু আগুনের ফুলকিই তৈরী করে, মানুষ চাইছিল এমন এক দাহ্য বস্তু যা সামান্য আগুনের ফুলকি পেলেই জ্বলে উঠবে।

www.purepdfbook.com

১৬৮০ সালে হাউক উইৎস নামক এক বিজ্ঞানীই প্রথম নরম কাঠকে সরু সরু করে চিরে সে কাঠিকে ভালভাবে শুকিয়ে তাতে গন্ধকের প্রলেপ দিয়ে আধুনিক দেশলাইকাঠির প্রাচীন রূপ সৃষ্টি করলেন। এই কাঠিতে চক্‌মকি পাথর একটু ঠুকলেই জ্বলে উঠত। বহুদিন কেটে যাবার পর ১৮০৫ সালে ইউরোপের চ্যানসেল নামক এক বিজ্ঞানী পাতলা কাঠির মাথায় পটাশিয়াম ক্লোরেট ও চিনির আঠালো মিশ্রণ লাগিয়ে সেই কাঠিকে ঘন সালফিউরিক অ্যাসিডের দ্রবণে ডুবিয়ে আগুন জ্বালালেন। কিন্তু ঘন সালফিউরিক অ্যাসিড খুব বিপজ্জনক। তাই সহজ ও নিরাপদভাবে আগুন জ্বালার উপায় ভাবতে লাগলেন বিজ্ঞানীরা।

১৮৩৭ সালে ওয়াকার নামক এক বিজ্ঞানী ভাবলেন দুটি বস্তুর ঘর্ষণে অণুর গতি বৃদ্ধির জন্যই তাপ উৎপন্ন হয়। এই দুটি বস্তুর একটি যদি সহজ দাহ্য পদার্থ হয় তাহলে ঘর্ষণে আগুনও উৎপন্ন হওয়া সম্ভব। এই ভাবনা থেকেই তিনি কাঠির মাথায় অ্যান্টিমনি সালফাইড, পটাসিয়াম ক্লোরেট, পটাসিয়াম ডাই ক্রোমেট, রেড লেড ও গঁদের আঠার সাথে মিশিয়ে লাগালেন। হাল্কা ও পাতলা কাঠ দিয়ে বাক্স তৈরী করে দু'চারবার ঘষতেই জ্বলে উঠল আগুন। এই প্রথম নিরাপদ ঘর্ষণ দেশলাই আবিষ্কৃত হল।

এর বছর কুড়ি পঁচিশ পরে বিজ্ঞানীদের চেষ্টায় আবিষ্কৃত হল আরেক রকম নিরাপদ দেশলাই। এই দেশলাইয়ের কাঠিতে রেড ফসফরাস, পটাসিয়াম ক্লোরেটের সাথে আঠা মিশিয়ে লাগানো হত। বাক্সের দুদিকে রেড লেড, সোডিয়াম নাইট্রেট, বালি বা মিহি কাচের গুঁড়োর মিশ্রণকে আঠা দিয়ে প্রলেপ দেওয়া থাকত। বাক্সের যে কোনো দিকে কাঠি ঘষলেই জ্বলে উঠত।

কাঠি যাতে সহজে ফুঁ দিলে নিভে যায় ও নিভে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে একেবারে ছাই হয়ে যায় তার জন্য কাঠিকে সোহাগার দ্রবণে বা অ্যামোনিয়াম ফসফেটের দ্রবণে ডুবিয়ে শুষ্ক করা হয়।

বর্তমানে নরম কাঠের পরিবর্তে শক্ত কাগজকেও কাঠি করে ব্যবহার করা হচ্ছে। কাঠির মাথায় আস্তরণ লাগাবার আগে একরকম প্লাস্টিকের মধ্যে কাঠিকে ডুবিয়ে রাখলে কাঠি জলে ভিজে গেলেও জ্বলতে অসুবিধা হয় না।

www.purepdfbook.com

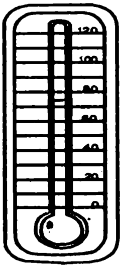

থার্মোমিটার

(সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ)

বিজ্ঞানী ফ্লোরেন্স

এক পাত্র ঠাণ্ডা জল আগুনে বসালে অর্থাৎ তাপ প্রয়োগ করলে জলটি গরম হয়ে ওঠে এবং এক সময় ফুটতে শুরু করে। আগুনের তাপ এভাবে পাত্রটির মাধ্যমে জলে সঞ্চালিত হয়ে জলের উষ্ণতাকে বাড়িয়ে তোলে। এই উষ্ণতাকে মানুষ পরিমাপ করতে চাইতো। কিন্তু স্পর্শ দিয়ে তা অনুভব করা সম্ভব নয়, তারজন্য দরকার তাপমান যন্ত্র।

তাপমাত্রা নির্ণয়ের জন্য তাপমান যন্ত্রের কথা ১৫৯২ সালে প্রথম মাথায় আসে বিজ্ঞানী গ্যালিলিওর। কিন্তু শেষপর্যন্ত তাঁর আবিষ্কৃত থার্মোমিটারটি কেমনভাবে তৈরী হয়েছিল তা আমরা জানি না। প্রথম যে থার্মোমিটার যন্ত্রের কথা জানা যায় তা আবিষ্কার করেছিলেন সপ্তদশ শতকের মধ্যভাগে ইটালী দেশের বিজ্ঞানী ফ্লোরেন্স। তিনি একটি কাচের সরু নল বানিয়ে তার মধ্যে অ্যালকোহল পুরলেন তারপর নলের মুখ বন্ধ করে দিলেন। অ্যালকোহল নেওয়ার কারণ এটি তরল পদার্থ হওয়ায় কঠিন পদার্থের চেয়ে এর হ্রাস-বৃদ্ধির পরিমাণ বেশী। জল যেমন ঠাণ্ডায় জমে বরফ হয়ে যায়, অ্যালকোহলের বরফ হয়ে যাবার সম্ভাবনা নেই। এই যন্ত্রে শুধু উষ্ণতা বৃদ্ধি পাচ্ছে কিনা সেটাই বোঝা যেত, কিন্তু কাচের নলের গায়ে দাগ কাটা না থাকায় উষ্ণতা বৃদ্ধি পরিমাপ করা যেত না।

এই আবিষ্কারের বহুকাল পরে ১৭১৪ সালে হল্যাণ্ডের ড্যানিয়েল গ্যাব্রিয়েল ফারেনহাইট নামক এক বিজ্ঞানী এই থার্মোমিটারের মান অনেক উন্নত করেন। তাঁর থার্মোমিটারটিও ছিল একটি কাচের নল। কিন্তু তিনি বিজ্ঞানী ফ্লোরেন্সের মত কাঁচের নলে অ্যালকোহল না নিয়ে পারদ ভরলেন। কারণ পারদ চকচকে। কাচের নলের গা ভিজিয়ে দেয় না। তাপমাত্রা পরিবর্তনে

www.purepdfbook.com

পারদের আয়তনের পরিবর্তন নিয়মানুগ হয়। প্রসারিত হওয়ার জন্য পারদ বস্তু থেকে অতি সামান্য তাপ নেয়।

কাচের নলের একপাশ গলিয়ে নিয়ে অপর পাশে ফুঁ দিয়ে একটি গোলাকার গর্ত তৈরী করে তার মধ্যে পারদ ভরে তিনি খোলা মুখটিকে গলিয়ে বন্ধ করে দিলেন। তাপমাত্রার সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন মান নির্ধারণের জন্য তিনি এবার কাচের নলের পারদ ভরা মুখটিকে বরফ কুচির মধ্যে ঢুকিয়ে এবং তারপর ফুটন্ত জলের বাষ্পে ধরে দুটি স্থিরাঙ্ক নির্ধারণ করেন। এভাবে তিনি দুই স্থিরাঙ্কের মধ্যবর্তী স্থানকে ১৮০ ভাগে ভাগ করেন। তিনি দেখেন জল ৩২ ডিগ্রীতে জমে বরফ হয় এবং ২১২ ডিগ্রীতে বাষ্পে পরিণত হয়। মানুষের দেহের স্বাভাবিক তাপমাত্রা ৯৬ ডিগ্রী। শরীরের তাপমাত্রা নির্ণয়ের জন্য আমরা এই ফারেনহাইট স্কেলই ব্যবহার করি।

এর পরবর্তীকালে বিজ্ঞানী রোমার হিমাঙ্ক ও স্ফুটনাঙ্ক ০ ডিগ্রী ও ৮০ ডিগ্রী ধরে এক ধরণের তাপমান যন্ত্র তৈরী করেন। তাঁর নামানুসারে এই স্কেলকে বলে রোমার স্কেল।

সুইডেনের বিজ্ঞানী সেলসিয়াস হিমাঙ্ক ও স্ফুটনাঙ্ক ০ ডিগ্রী ও ১০০ ডিগ্রী ধরে যে স্কেল তৈরী করেন তাকে বলে সেলসিয়াস স্কেল। আবিষ্কারকের নামানুসারে এই নাম দেওয়া হয়েছে। তবে এই স্কেল সেন্টিগ্রেড স্কেল হিসাবেই বেশী পরিচিত। উষ্ণতা পরিমাপে এই স্কেলটি বেশী ব্যবহৃত হয়।

মানুষের দেহের তাপ মাপার জন্য যে ডাক্তারী থার্মোমিটার হয় সেটির একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য আছে। থার্মোমিটারের ভেতরের সরু নলটা যেখান দিয়ে পারদটা ঢোকানো হয়, সেটা গর্ত মত মুখের ওপরে একটু বাঁকানো থাকে। ফলে মানুষের শরীর থেকে থার্মোমিটার বের করে আনলে বাইরের তাপমাত্রা কম হয়ে গেলেও বাঁকানো পথ দিয়ে সহজে পারদ নেমে যেতে পারে না। সর্বনিম্ন তাপমাত্রার ক্ষেত্রে একটা সীমারেখা আছে, কিন্তু উচ্চ তাপমাত্রা সম্পর্কে কোন পরিসীমা নেই। তাই এখনও বহু উন্নত থার্মোমিটার তৈরী করার চেষ্টা চলছে।

www.purepdfbook.com

হাইড্রোজেন গ্যাস ও জলের স্বরূপ (১৭৬৬)

হেনরী ক্যাভেন্ডিস (১৭৩১-১৮১০)

বিশ্ববিখ্যাত বিজ্ঞানী ক্যাভেন্ডিস ছিলেন অতি লাজুক স্বভাবের। মানুষের সঙ্গে আগ বাড়িয়ে মিশতে তিনি খুব লজ্জা পেতেন। ক্যাভেন্ডিসের ধনী পিতা লর্ড চার্লস ক্যাভেন্ডিস তাঁর কিশোর ছেলের জন্য বাড়ীতেই বানিয়ে দিয়েছিলেন একটি গবেষণাগার। সেখানে বসেই ক্যাভেন্ডিস তাঁর বিজ্ঞানের পরীক্ষা-নিরীক্ষাগুলি করতেন।

১৭৬৬ সালে ক্যাভেন্ডিস টিন, দস্তা ও লোহা প্রভৃতি ধাতুর ওপর লঘু সালফিউরিক অ্যাসিড বা হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড ঢেলে পরীক্ষা করছিলেন। এসময় একটি বর্ণহীন গ্যাস উৎপন্ন হচ্ছিল। তিনি পরীক্ষা করে দেখলেন গ্যাসটি বায়ুর চেয়েও হাল্কা, বায়ুতে দহন করলে সেটি নীলাভ শিখায় জ্বলতে থাকে। তিনি প্রথম ভেবেছিলেন বিজ্ঞানী স্টালের ফ্লোজিস্টন তত্ত্ব অনুসারে গ্যাসটি বোধ হয় ফ্লোজিস্টন। কিন্তু পরবর্তীকালে জানা যায় গ্যাসটি হাইড্রোজেন। ১৭৬৬ সালে তিনি তাঁর গবেষণার ফলাফল ইংলণ্ডের রয়্যাল সোসাইটিকে জানিয়েছিলেন।

ক্যাভেন্ডিস লক্ষ্য করেছিলেন বায়ুতে ঐ হাইড্রোজেন গ্যাসটিকে দহন করলে একটি স্বচ্ছ তরল পদার্থ উৎপন্ন হয়। ঐ তরল পদার্থের বৈশিষ্ট্য বা প্রকৃতি জানবার জন্য তিনি একদিন একটি বদ্ধ কাচ নলে দুভাগ হাইড্রোজেন ও এক ভাগ অক্সিজেন প্রবেশ করিয়ে তারপর বিদ্যুৎ স্ফুলিঙ্গের সাহায্যে বিস্ফোরণ ঘটিয়ে অবাক হয়ে দেখলেন কাচ গোলকের ভেতরে জমা হয়েছে বিন্দু বিন্দু তরল পদার্থ। তরল পদার্থটি ছিল বর্ণহীন, গন্ধহীন, স্বাদহীন স্বচ্ছ। তরল পদার্থটিকে বাষ্পীভূত করলে কোনো কিছু অবশিষ্ট থাকে না। জলের মত দেখতে হওয়ায় তিনি সমপরিমাণ জল ও ঐ তরল নিয়ে ওজন করে দেখলেন দুটির ওজনই সমান। তিনি অনেকবার ঐ একই পরীক্ষা করে বুঝলেন ঐ উৎপন্ন পদার্থটি জল।

ক্যাভেন্ডিসের যুগে বিজ্ঞানীদের ধারণা ছিল জল মৌলিক পদার্থ। কিন্তু

এই পরীক্ষার মাধ্যমে ক্যাভেন্ডিস প্রমাণ করলেন জল হাইড্রোজেন ও অক্সিজেনের একটি যৌগ। জলের মধ্যে আছে দু'ভাগ হাইড্রোজেন ও এক ভাগ অক্সিজেন।

বাষ্পীয় ইঞ্জিন (১৭৬৯)

জেমস ওয়াট (১৭৩৬—১৮১৯)

বাষ্পের শক্তি সম্পর্কে প্রাচীন যুগের মানুষ যে কিছুই জানত না এমন নয়। প্রায় ২০০০ বছর আগে আলেকজান্দ্রিয়া শহরের অধিবাসী হিরো বাষ্পীয় শক্তিকে গতিবেগ দিয়েছিলেন। কিন্তু বাষ্পীয় শক্তিকে তিনি মানুষের কোনো প্রয়োজনীয় কাজে ব্যবহার করেননি। সপ্তদশ শতাব্দীতে বিজ্ঞানী প্যাপিন বাষ্পশক্তিকে কাজে লাগিয়ে একটি ইঞ্জিন তৈরী করেছিলেন। এই বাষ্পীয় শক্তিকে ব্যবহারিকভাবে প্রথম কাজে লাগানোর কথা জেমস ওয়াটের মাথায় আসে।

জেমস ছোটবেলা শারীরিক ভাবে ছিল খুব দুর্বল। তাই তাঁর বাবা তাঁকে স্কুলে ভর্তি না করে বাড়ীতেই পড়াশোনা করাতেন। স্কুলে ভর্তি না হয়েও অল্প বয়সেই জেমস জ্যামিতি ও বিজ্ঞান বিষয়ে বেশ দক্ষ হয়ে উঠেছিলেন। বাড়ীতে থাকার জন্য জেমসের বন্ধু-বান্ধবও বেশী ছিল না তাই বাবা-মায়ের সঙ্গেই সর্বক্ষণ সময় কাটাতে হত তাকে।

একদিন জেমসের মা স্টোভে কেটলিতে চায়ের জল চাপিয়েছেন। কেটলির জল গরম হয়ে ফুটছে। জেমস স্টোভের কাছেই বসেছিল। সে অবাক হয়ে দেখতে লাগল কেটলির ঢাকনা আপনা থেকে ওঠা নামা করছে আর ভেতর থেকে সাদা ধোঁয়া ঢাকনা ঠেলে এবং কেটলির নলের মুখ দিয়ে বেরিয়ে আসছে। জেমস বুঝতে পারল ভেতরের জলীয় বাষ্পের চাপের জন্যই এভাবে ঢাকনা ওঠা নামা করছে। তখনই জেমসের হঠাৎই মনে হয় বাষ্প যদি কেটলির ঢাকনাকে ওঠানামা করাতে পারে তাহলে এই বাষ্পীয়

শক্তির সাহায্যে অনেক ভারী কাজও তো সহজে করা যায়।

এই ঘটনার কথা জেমসের মন থেকে মুছে গেল না। উনিশ বছর বয়সে কারিগরী বিদ্যায় ডিপ্লোমা নিয়ে পাশ করে তিনি গ্লাসগো বিশ্ববিদ্যালয়ে ট্রেভিথিক নামের এক ইঞ্জিনিয়ারের যন্ত্র মেরামতের কাজে যোগ দেন। এ সময় টমাস নিউকোমেন নামক এক ইংরেজ কামারের তৈরী ১৭১২ সালে আবিষ্কৃত একটি বাষ্পীয় পাম্প তার হাতে আসে। তখনই তাঁর মনে পড়ে যায় ছোটোবেলার সেই দিনটির কথা। তখন তিনি ট্রেভিথিকের সাথে বাষ্প শক্তিকে কাজে লাগানোর জন্য নানা গবেষণা শুরু করেন। শেষপর্যন্ত ১৭৬৯ সালে বাষ্পশক্তিকে কাজে লাগিয়ে বাষ্পীয় ইঞ্জিন তৈরী করেন।

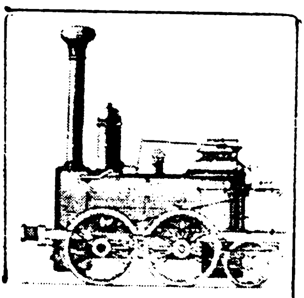

ট্রেভিথিকের ইঞ্জিন

বাষ্পীয় ইঞ্জিনে বাষ্পকে দুই দিক বন্ধ করা একটি নলের ফাঁকা জায়গায় ঢোকানো হয়। এই নলটিকে বলে সিলিণ্ডার। এর ভেতরে একটি পিস্টন নামের চাপদণ্ড লাগানো থাকে। যেটা ফাঁপা সিলিণ্ডারের ভেতর ওঠা নামা করে। এটি শক্তভাবে এঁটে থাকে বলে বাষ্প একটুও বের হতে পারে না। সিলিণ্ডারে বাষ্প ঢোকার দুটি পথ থাকে। এই পথগুলি ভালভ্ দিয়ে খোলা বা বন্ধ করা যায়। বাষ্প সিলিণ্ডারের একদিক দিয়ে ঢুকলে তার চাপে পিস্টন অন্যদিকে সরে যায়। আবার বাষ্প যখন অপর দিক দিয়ে ঢোকে তখনই পিস্টন আবার নিজের জায়গায় ফিরে আসে। পিস্টনের ওঠা-নামায় যে গতিবেগ সৃষ্টি হয় তা পাম্প চালানোর কাজে লাগে। উপযুক্ত লিভারের সাহায্য নিয়ে এই ওঠানামার গতিবেগ দিয়ে যেকোনো চাকাও ঘোরানো যায়। এই বাষ্পীয় ইঞ্জিন আবিষ্কারের ফলেই পরবর্তীকালে বহু যন্ত্রপাতি তৈরী করা সম্ভব হয়েছে।

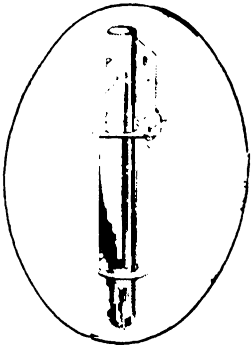

অণুবীক্ষণ যন্ত্র (১৬৭৩)

অ্যান্টনি ভ্যান লীবেন হুক (১৬৩২—১৭২৩)

ষোড়শ শতাব্দীতে গ্যালিলিও দূরবীণ আবিষ্কার করলেন এবং তাঁর দূরবীণ নিয়ে নানা পরীক্ষা করতে করতে তিনি না জেনেই লেন্সগুলির ব্যবধান বাড়িয়ে ফেলেন। তার ফলে দূরবীণে যেখানে দূরের জিনিসকে বড় করে দেখা যায় সেখানে কাছের জিনিসকে বড় করে দেখা যেতে লাগল। এর থেকে তাঁর মাথায় অণুবীক্ষণ যন্ত্র তৈরীর চিন্তা আসে। পনেরো বছর ধরে তিনি যন্ত্রটিকে নিখুঁত করার নানা চেষ্টা করেন। তবু অণুবীক্ষণ যন্ত্রের আধুনিক রূপ তিনি দিতে পারেননি। ১৫৯০ সালে জ্যাকারিয়াস জ্যানসন যে যন্ত্রটি তৈরী করেন সেটির সঙ্গে বর্তমানের আধুনিক অণুবীক্ষণ যন্ত্রের অনেক মিল পাওয়া যায়। তবে এই যন্ত্রটিযে বিজ্ঞান জগতে কতখানি গুরুত্বপূর্ণ স্থান করে নিতে পারবে এবং কত প্রয়োজনীয় কাজে এ যন্ত্রটিকে লাগানো যেতে পারে সে সম্পর্কে তাঁর কোনো ধারণাই ছিল না।

অণুবীক্ষণ যন্ত্রের প্রকৃত আবিষ্কার হয় সপ্তদশ শতাব্দীতে। এক ওলন্দাজ চশমার দোকানদার অ্যান্টনি ভ্যান লীবেন হুক অণুবীক্ষণ যন্ত্রের গুরুত্ব বিজ্ঞান জগতে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন।

চশমার দোকানদার হলেও লীবেন হুকের আকর্ষণ ছিল দৃষ্টিতত্ত্ব বা আলোক বিজ্ঞানের প্রতি। কাচকে সযত্নে ঘষে ঘষে তিনি নানা ধরনের লেন্স বানাতেন এবং তামার পাতের তৈরী নলের মুখে লেন্স বসিয়ে এটা ওটা পরীক্ষা করে দেখতেন। এভাবে কাচ ঘষে লেন্স বানাতে তিনি এতই দক্ষ হয়ে উঠেছিলেন যে তাঁর তৈরী বিবর্ধক কাচ দিয়ে যে জিনিসকে তিনি দেখতে চাইতেন তা

সেই জিনিসের নিজস্ব আকারের ২০০ গুণ বড় করে দেখা যেত। তাঁর এই যন্ত্রটি দিয়ে তিনি প্রাণীর চামড়া, লোম, চুল সব কিছুই পরীক্ষা করে দেখতেন। হঠাৎ তাঁর একদিন কি খেয়াল হল খোলা জায়গায় পড়ে থাকা কিছুটা পচা জল এনে কাচের ওপর রেখে ঐ যন্ত্র দিয়ে পরীক্ষা করলেন। দেখে অবাক হয়ে গেলেন তিনি। জলের মধ্যে কত কি কিল্‌বিল্‌ করছে। এবার কিছুটা পরিষ্কার জল কাচের ওপর রেখে তিনি পরীক্ষা করে দেখলেন তাতেও কিসব কিল্‌বিল্‌ করছে বটে তবে পচা জলের তুলনায় তাদের পরিমাণ অনেক কম। এবার তিনি কিছুটা স্বচ্ছ পরিষ্কার জলকে কিছুদিন খোলা জায়গায় রেখে তারপর পরীক্ষা করে দেখলেন পরিষ্কার জলের তুলনায় অনেক বেশী কিসব কিল্‌ বিল্‌ করছে। এবং সেগুলি নানা আকারের ও নানা মাপের। আবার একে অন্যের সাথে অদ্ভুত ভাবে ধাক্কা খেয়ে সরে যাচ্ছে। এর থেকে তাঁর ধারণা হয় যে জলে অনেক ছোট ছোট জীব বাস করে। এগুলি অণুবীক্ষণ যন্ত্র ছাড়া খালি চোখে দেখা যায় না। দূষিত জলে এরা আপনা থেকে জন্মায় তাই পরিষ্কার জলের তুলনায় দূষিত জলে এদের পরিমাণ বেশী থাকে। তাঁর দেখা ঐ ছোট ছোট জীবগুলির মধ্যে সবচেয়ে ছোটগুলিকেই পরবর্তীকালে জীবাণু নাম দেওয়া হয়েছিল।

লীবেন হুক তো বৈজ্ঞানিক ছিলেন না, আর বিদ্বান লোকেদের লিখিত ভাষা ল্যাটিনও তিনি জানতেন না, তাই বিজ্ঞানের আলোচনা বিষয়ক বই পড়া তাঁর পক্ষে সম্ভব ছিল না। অথচ এই নতুন জীব সম্পর্কে তাঁর জানার উৎসাহ ক্রমশই বেড়ে চলছিল।

সকলে তাঁকে পরামর্শ দিল লণ্ডনের রয়্যাল সোসাইটীর সাথে যোগাযোগ করে তাঁর আবিষ্কারের কথা লিখে জানাতে। ১৬৭৩ খ্রীষ্টাব্দে তিনি লেন্সের মধ্য দিয়ে যেসব অদ্ভুত জীব দেখেছিলেন তার বিশদ বিবরণ দিয়ে রয়্যাল সোসাইটীতে চিঠি লেখেন। সে সময় বহু বিখ্যাত বিজ্ঞানীরা ছিলেন রয়্যাল সোসাইটীর সদস্য, তাঁরা এমন আশ্চর্য আবিষ্কারের কথা জানতে পেরে অবাক হলেন আবার লীবেন হুক এক অতি সাধারণ দোকানদার বলে তাঁকে পাত্তাও দিলেন না, তবু একেবারেই নিরুৎসাহিত করলেন না তাকে। তাঁরা লীবেন হুককে তাঁর আবিষ্কার সম্পর্কিত লেখা চালিয়ে যেতে বললেন।

লীবেন হুকও পঞ্চাশ বছরে রয়্যাল সোসাইটীতে তাঁর আবিষ্কার সম্বন্ধীয় ৩৭৫ টি চিঠি পাঠালেন। তাঁর লেখা কয়েকটি চিঠিতে অদ্ভুত জীবদের কথা পড়ে বিজ্ঞানীরা খুবই আগ্রহী হন। তাঁরা সবাই লীবেন হুকের কাছে যান এবং লীবেন হুক তাঁর যন্ত্র দিয়ে সবকিছু পরীক্ষা করে দেখান। কিভাবে ঐ লেন্স লীবেন হুক তৈরী করেছেন তা তাঁরা জানতে চান যাতে তাঁরাও সে রকম লেন্স তৈরী করে পরীক্ষা চালাতে পারেন। কিন্তু লীবেন হুক তাঁর গোপন তথ্য জানাতে আগ্রহী হলেন না। বিজ্ঞানীরা হতাশ হয়ে ফিরে এলেন। শেষে বাধ্য হলেন লীবেন হুকের যন্ত্র আবিষ্কারের কথা প্রচার করতে। যন্ত্রটির নাম দেওয়া হল অণুবীক্ষণ যন্ত্র। এই যন্ত্রে কোনো পদার্থকে হাজার গুণ বা তারও বেশী বড় করে দেখা সম্ভব। এ যন্ত্রে দুটি লেন্স থাকে। একটির নাম অভিলক্ষ্য, সেটি দ্রষ্টব্য পদার্থের দিকে থাকে। অন্যটি অভিনেত্র। এটি চোখে লাগিয়ে দেখা হয়।

লীবেন হুকের অণুবীক্ষণ যন্ত্রের আবিষ্কারের পর পরবর্তীকালে নানা ধরণের অণুবীক্ষণ যন্ত্র আবিষ্কৃত হয়েছে।

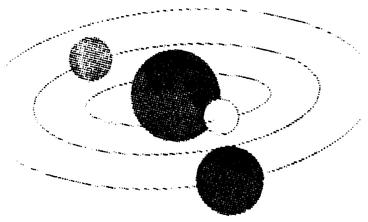

ইউরেনাস (১৭৮১)

ফ্রেডরিক উইলিয়াম হার্সেল

প্রাচীনকালেই মানুষ বুধ, শুক্র, মঙ্গল, বৃহস্পতি, শনি এই পাঁচটি গ্রহকে দেখতে পেয়েছিল কারণ এই গ্রহগুলিকে খালি চোখেই দেখা যায়।

গ্যালিলিওই প্রথম দূরবীণভিত্তিক জ্যোর্তিবিজ্ঞানের সূত্রপাত করেন। বার্লিনের জ্যোর্তিবিজ্ঞানী বোর্ড ও টিসিয়াস সূর্য থেকে গ্রহদের দূরত্ব কত হবে তার এক বিশেষ ধরণের গণনা করেছিলেন। ওঁনারা দেখিয়েছিলেন সূর্য থেকে গ্রহদের অবস্থানের একটি নির্দিষ্ট অনুপাত আছে। তাঁদের সূত্রগুলি প্রকাশের পরই বিজ্ঞানীর অনুমান করতে শুরু করেন যে শনি গ্রহের পরেও

আরো গ্রহ থাকা সম্ভব। অনেকেই এ বিষয়ে গবেষণার জন্য এগিয়ে এসেছিলেন।

ফ্রেডরিক উইলিয়াম হার্সেল ছিলেন সঙ্গীতজ্ঞ, কিন্তু ছোটবেলা থেকেই তাঁর আকাশ পর্যবেক্ষণ ও জ্যোর্তিবিজ্ঞানের প্রতি আগ্রহ ছিল। তাঁর মানমন্দিরে বসে নিজ হাতে একটি শক্তিশালী দূরবীণ বানিয়ে তিনি রোজ রাতে আকাশ পর্যবেক্ষণ করতেন। একদিন রাতে তিনি মিথুন রাশিকে পর্যবেক্ষণ করতে গিয়ে দেখলেন আকাশের গায়ে একটি জ্যোতিষ্ক উঁকি দিচ্ছে। তিনি ভাবলেন ওটা বোধহয় ধূমকেতু। কিন্তু অনেক গবেষণা করে তিনি বুঝতে পারলেন ধূমকেতুর যেমন অর্ধবৃত্তাকার পথে চলার কথা জ্যোতিষ্কটি তেমনভাবে যাচ্ছে না। তিনি তখন বুঝতে পারলেন তিনি একটি নতুন গ্রহ আবিষ্কার করেছেন।

গ্রহটির নামকরণ করার জন্য তিনি রাজা তৃতীয় জর্জের সম্মানে নাম দিলেন জর্জডিয়ান সাইডাস। কিন্তু এ নাম চালু হল না। ফরাসী বিজ্ঞানী লালাডে নাম দিলেন হার্সেল, কিন্তু তাও গৃহীত হল না শেষপর্যন্ত নাম দেওয়া হল ইউরেনাস। সেটিই স্বীকৃতি পেল। ইউরেনাসের চারদিক এরিয়েল, অ্যামব্রিয়েল, টাইটানিয়া, অবেরস ও মিরান্ডা এই পাঁচটি উপগ্রহ আবর্তন করছে।

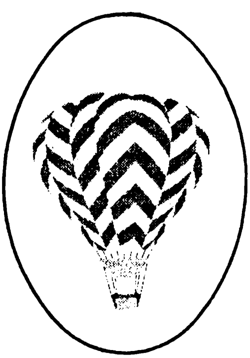

বেলুন (১৭৮৩)

রোজিয়ার, আরল্যাণ্ডিস

বেলুন তৈরীর চিন্তা প্রথম মাথায় আসে ফরাসী দেশের দুই ভাইয়ের। তারা জানতো গরম বাতাস ঠাণ্ডা বাতাসের চেয়ে হাল্কা। তাই ১৭৮৩ সালে ৯ জুন কাগজের তৈরী বড় থলে তৈরী করে খটকুটো জ্বালিয়ে তার মধ্যে

গরম ধোঁয়া পুরে দিল আর বেলুনের নীচে একটা ঝুড়ি বেঁধে সেই ঝুড়ির মধ্যে বসিয়ে দিল একটি ভেড়া, একটি মোরগ ও একটি হাঁস। গরম ধোঁয়া বাতাসের চেয়ে হাল্কা বলে বেলুনটা ওপরে উঠে গেল আবার কিছুক্ষণ উড়ে যাওয়ার পর ধোঁয়া ঠাণ্ডা হয়ে যেতে থাকায় বেলুন নীচে নেমে এল।

১৭৮৩ সালে ২১ নভেম্বর দুজন ফরাসী যুবক রোজিয়ার ও অরল্যাণ্ডিস বেশ বড় লিনেন অস্তর দেওয়া কাগজের ব্যাগের সঙ্গে একটা বাক্স ঝুলিয়ে দিয়ে সেই বাক্সের মধ্যে তাঁরা উঠে বসলেন। বাক্সের মধ্যে ছিল মুখ খোলা বড় একটা স্টোভ। কাগজের ব্যাগটি ছিল ছিল ৫৮ ফুট চওড়া। কাগজের বাক্সে গরম বাতাস পুরে দিতেই সেটা বাক্সশুদ্ধ দুই ফরাসী যুবককে নিয়ে উড়ে চলল আকাশে। এঁরা হলেন সর্বপ্রথম আকাশে বিচরণকারী মানুষ। বেলুনে চড়ে আকাশে ৫০০ ফুট ভ্রমণ করেছিলেন তাঁরা।

১৮১১ সালেরও পরে বিজ্ঞানী চার্লস বেলুন নিয়ে গবেষণা করতে গিয়ে দেখলেন গরম বাতাস পুরে বেলুন ওড়াবার খুব অসুবিধা। ধোঁয়াকে গরম রাখার জন্য বেলুনের নীচে স্টোভ বেঁধে দিতে হয়। তাতেও বেলুন বেশী দূর যেতে পারে না। এজন্য তিনি গরম ধোঁয়ার বদলে বাতাসের চেয়ে হাল্কা হাইড্রোজেন গ্যাস ভরে বেলুন ওড়াবার কথা ভাবলেন।

বিজ্ঞানী চার্লস ৩৫ ফুট চওড়া এক বেলুন বানিয়ে তাতে হাইড্রোজেন গ্যাস পুরে আকাশে ছেড়ে দিয়েছিলেন। বেলুনটি প্রায় তিন হাজার ফুট ওপরে উঠে কোথায় গেছিল কেউ বলতে পারল না। পরদিন বেলুনটা গিয়ে পড়ল একটা অখ্যাত গ্রামের মাঠে। গাঁয়ের লোকেরা ভাবল ওটা বুঝি বিরাট জানোয়ার। সাহসী গ্রামবাসীরা দূর থেকে ইঁট-পাটকেল ছুঁড়ে বর্শা বিঁধিয়ে বিকট বস্তুটাকে জর্জরিত করে ফেলল। তারপর কাছে গিয়ে দেখল সেটা কোনো জানোয়ার নয়—কেবল একটা বেলুন। বিজ্ঞানী চার্লসই কাগজের এই থলের নাম দিয়েছিলেন বেলুন। হাইড্রোজেন গ্যাসের বেলুন ওপরে উঠলে বাতাসের গতি অনুযায়ী চলত। ইচ্ছামত চালানো যেত না।

তড়িৎ কোষ (১৭৮৯)

লুইজি গ্যালভানি (১৭৩৭—১৭৯৮)

লুইজি গ্যালভানি সবার কাছে পরিচিত হয়েছিলেন 'ব্যাঙ নাচানো অধ্যাপক' নামে। সারাদিন মরা ব্যাঙের ঠ্যাঙের নাচন দেখে কাটিয়ে দিতেন তিনি। মরা ব্যাঙের ঠ্যাং নাচিয়ে যার সময়ে কেটে যায় লোকে তাকে পাগল ছাড়া আর কি ভাববে। কিন্তু কে কি ভাবল তা নিয়ে মাথাব্যথা ছিল না তাঁর। তাঁর এই নিরলস গবেষণা থেকেই পরবর্তীকালে এক অত্যাশ্চর্য আবিষ্কার হয়েছিল।

বাবা ছিলেন ধর্মযাজক, গ্যালিভানি ছোটেবেলা ভাবতেন তিনিও বাবার মত ধর্মযাজক হবেন। কিন্তু তার বাবা তা চাননি। তিনি চেয়েছিলেন ছেলে চিকিৎসাবিদ্যা নিয়ে পড়াশোনা করুক। এজন্য তিনি গ্যালভানিকে বোলোনা বিশ্ববিদ্যালয়ের চিকিৎসা বিভাগে ভর্তি করে দেন। ঐ বিশ্ববিদ্যালয়ে ডাক্তারি পাশ করে তিনি ওখানেই অধ্যাপনার কাজ পান।

ঐ বিশ্ববিদ্যালয়েই ১৭৮০ সাল থেকে শারীরবিদ্যা বিষয়ে গবেষণা চালাচ্ছিলেন গ্যালভানি। বাড়ীতেও তৈরী করে নিয়েছিলেন একটি গবেষণাগার। তাঁর গবেষণার ব্যাপারে তাঁর স্ত্রী লুসিও তাঁকে সাহায্য করতেন।

১৭৮৯ সালে একদিন গ্যালভানি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের ব্যাঙের শরীরের গঠনপ্রণালী বোঝাবার জন্য একটি মরা ব্যাঙ ক্লাসে নিয়ে এলেন। ব্যাঙের গায়ের চামড়া ছাড়িয়ে একটি ধাতুর ট্রের ওপর রাখলেন। তারপর ব্যাঙটার শিরা, উপশিরা, স্নায়ু ইত্যাদির অবস্থান ছাত্রদের বোঝাবার জন্য একটি ধাতব শলাকা দিয়ে ব্যাঙের গায়ে যেই স্পর্শ করলেন অমনি ব্যাঙটা লাফিয়ে উঠল। ছাত্ররা সঙ্গে সঙ্গে জিজ্ঞাসা করলো এরকম হওয়ার কারণ কি? কিন্তু গ্যালভানি তো নিজেই জানেন না কারণটা। ছাত্রদের কি বলবেন!

ব্যাঙের ঠ্যাঙ নেচে ওঠার কারণ জানতেই তিনি উঠে পড়ে লাগলেন। বাড়ীতে ফিরে গবেষণাগারে তিনি একটি ব্যাঙ কেটে একটি তামার তারে

বেঁধে লোহার রডে ঝুলিয়ে রাখলেন, তারপর হঠাৎ কি একটা কাজে তিনি বেরিয়েছেন। তাঁর স্ত্রী সে সময় গবেষণাগারে এলেন স্বামীর খোঁজ করতে। হঠাৎ তাঁর চোখে পড়ল মরা ব্যাঙের ঠ্যাঙটা একবার ঝুলে পড়ছে আবার লাফিয়ে উঠছে। তিনি ভাবলেন এরকম হওয়ার কারণ কি, কৌতূহল মেটাতে তিনি কাছে গিয়ে লক্ষ্য করে দেখলেন রডে ঝুলানো ব্যাঙের পায়ের ঠিক নীচে রয়েছে একটি তামার শলাকা। ব্যাঙের পাটা যেই সেই তামার শলাকাতে ঠেকেছে অমনি লাফিয়ে উঠছে। স্বামী বাড়ী ফিরতেই তিনি ঘটনাটা জানালেন। গ্যালভানি বুঝলেন লোহার রডে ঝোলানো ব্যাঙের ঠ্যাঙ তামার শলাকায় স্পর্শ করছে বলেই এই সংকোচনটা হচ্ছে, তাঁর মনে হল বিদ্যুতের জন্যই বুঝি এইসব হচ্ছে। প্রাণী দেহের মধ্যেই বুঝি থাকে এই বিদ্যুৎ, তাই তামার শলাকা দিয়ে ছুঁলে অঙ্গ প্রত্যঙ্গ কেঁপে ওঠে। এই বিদ্যুতের তিনি নাম দিলেন প্রাণীর দেহজাত বিদ্যুৎ।

কিন্তু পরবর্তীকালে বিদ্যুৎ সৃষ্টি প্রক্রিয়ার এই ব্যাখ্যা মেনে নিলেন না ইটালীর পাভিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থবিদ্যার অধ্যাপক আলেকজান্দ্রো ভোল্টা। ব্যাঙ নেচে ওঠার কারণ বিদ্যুৎ ঠিকই, তবে এই বিদ্যুৎ প্রাণীর দেহ থেকে নয়, রাসায়নিক প্রক্রিয়ার ফলে সৃষ্ট। দুটি ভিন্ন ধাতু নুন বা সোডিয়াম ক্লোরাইডের দ্রবণের সংস্পর্শে রাখলে যে রাসায়নিক বিক্রিয়া হয় তার ফলে বিদ্যুৎ উৎপন্ন হয়। ব্যাঙের স্নায়ুকোষের মধ্যে থাকে নুন জল। তাই লোহা ও তামার দুটি ভিন্ন ধাতু যখন ব্যাঙের শরীরে স্পর্শ করে তখনই বিদ্যুৎ উৎপন্ন হয় আর তার ফলেই ব্যাঙের ঠ্যাঙ লাফিয়ে ওঠে।

ভোল্টা তাঁর এই ব্যাখা প্রমাণের জন্য কতগুলি দস্তা ও তামার পাত একটার পর একটা সাজিয়ে প্রতিটি দস্তা ও তামার পাতের মধ্যে সোডিয়াম ক্লোরাইডে ভেজানো ব্লটিং কাগজ বা কাপড় রেখে দেন। এই জিনিসটার নাম তিনি দেন তড়িৎ কোষ। এই কোষের সবচেয়ে ওপরে রাখেন দস্তার পাত আর নীচে রাখেন তামার পাত, এবার একটি তামার তার দিয়ে উপরের দস্তার পাত ও নীচে তামার পাত যুক্ত করে দেখান যে কোষটির ভিতর দিয়ে বিদ্যুৎ প্রবাহিত হচ্ছে। এই তড়িৎ-কোষটিকে তাঁর নামানুসারে নাম দেওয়া হয় ভোল্টা-সেল। এই কোষ বা সেল থেকেই পরবর্তীকালে বৈদ্যুতিক ব্যাটারীর সৃষ্টি হয়েছে।

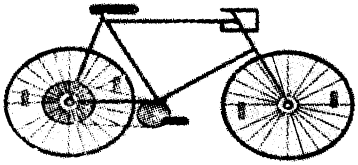

সাইকেল (১৭৯০)

জাঁ থীসন এবং দ্য সিওরাক

১৭৯০ সালে মধ্যে ফ্রান্সে প্রথম দু চাকার সাইকেল তৈরী হয়।

জাঁ থীসন এবং তাঁর পরে দ্য সিওরাক নামের দুই ফরাসী ব্যক্তি সাইকেলের মত দেখতে দু চাকার একটা গাড়ী তৈরী করেন। এই গাড়ীর সামনে ও পিছনে দুটি চাকা ছিল। চাকা দুটিকে একটি লম্বা কাঠের দু পাশে এমনভাবে শক্ত করে আটকানো ছিল যে চাকাগুলো ভালভাবে ঘুরতে পারতো। দণ্ডের মাঝখানে কাপড়ের ফালি দিয়ে তৈরী হয়েছিল বসার জায়গা। হাতল, ব্রেক, প্যাডেল এসব কিছুই ছিল না। শুধু হাতলের জায়গায় ছিল লম্বা কাঠের ফালি। এই কাঠের ফালিকে ধরে মাটিতে পা ঠেকিয়ে সিটে বসে মাঝে মাঝে ঠেলা দিলে চাকা ঘুরতে ঘুরতে সামনে এগিয়ে যেতো।

১৮১৮ সালে জার্মানবাসী ব্যারন ভন্ দ্রেয়িস দ্য সয়ারবার্ণ তাঁর দ্রেয়িসিন নামের একটি তিন চাকার মেয়েদের সাইকেল তৈরী করেছিলেন। গতিবেগ বাড়ানোর জন্য এই সাইকেলের অনেক উন্নতি করা হয়েছিল। সামনে বড় চাকা ও পিছনে ছোট চাকা যুক্ত করা হয়েছিল। হাতলেরও উন্নতি হয়েছিলো। তবে মাটিতে পা ঠেকিয়েই চালাতে হত। ১৮১৯ সালে তিনি এই সাইকেলের প্রদর্শনীও করেন।

ব্যারন দ্য গ্যাভারবর্ন প্রথম তাঁর সাইকেলে হাতল যুক্ত করে গতিবেগ বাড়ানোর জন্য চাকার তলায় লোহার পাত লাগান, এই সাইকেলের নাম ছিল ডান্ডি হর্স। সাইকেলটিতে প্যাডেল ছিল না।

স্কটল্যাণ্ডের প্যাট্রিক ম্যাকমিলান প্রথম সাইকেলে প্যাডেল লাগান। এ সাইকেলের সামনের চাকার চেয়ে পেছনের চাকা ছিল খুবই ছোট। পরবর্তীকালে নানান পরীক্ষার পর বোঝা যায় সাইকেলের দুটো চাকা সমান হলে এবং চাকার তলায় টায়ার টিউব লাগালে অনেক সুবিধা হয়।

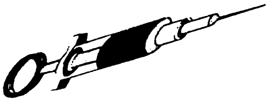

বসন্তের টিকা (১৭৯৬)

এডওয়ার্ড জেনার (১৭৪৯-১৮২৩)

এডওয়ার্ড জেনার ছিলেন ইংলণ্ডের ডাক্তার। তিনি গরীব লোকেদের জন্য ঘোড়ায় চড়ে ঘুরে ঘুরে চিকিৎসা করতেন। একসময় লণ্ডন শহরে বসন্ত রোগ মহামারী হয়ে দেখা দিয়েছিল। কিন্তু তখন বসন্ত রোগের কোনো প্রতিষেধক ছিল না। তাই চোখের সামনে রোগী মারা যাচ্ছে অথচ জেনার ডাক্তার হয়েও কিছু করতে পারছিলেন না। দিন রাত তিনি ভাবেন কি করে বসন্ত রোগকে প্রতিরোধ করা যায়।

নেলসিন নামের এক গয়লানী রোজ দুধ দিতে আসত জেনারকে। একদিন জেনার হঠাৎ তার হাতের দিকে তাকিয়ে অবাক হয়ে গেলেন। গোয়ালিনীর হাতে ফোস্কা উঠে শুকিয়ে যাওয়ার মত দাগ, তিনি তাকে জিজ্ঞাসা করলেন 'তোমার হাতে ওটা কিসের দাগ?' গোয়ালিনী বলল গরুর বাঁটের ঘা লেগে গোয়ালাদের হাতে এরকম দাগ প্রায়ই হয়। প্রথমে একটা ফোস্কা হয়, তারপর পুঁজ হয়। শুকিয়ে গেলে এই ধরণের দাগ রয়ে যায়।

ডাক্তার জেনার ভাবলেন এত মানুষের বসন্ত হচ্ছে, দীর্ঘদিন বহু বসন্ত রোগীর মধ্যে থেকেও এই গোয়ালিনীর বসন্ত রোগ হচ্ছে না কেন? তাহলে কি ঐ ফোস্কার জন্য? জেনার জিজ্ঞাসা করলেন 'যাদের হাতে ঐ দাগ আছে তাদের কি বসন্ত হয়েছে?' গোয়ালিনী বলল 'না'। তিনি গোয়ালিনীকে বললেন, 'তোমার গরুর বাঁটে যখন ঘা হবে তখন তা দেখাতে পারবে?' গরুর বাঁটে ক'দিন পর ঘা হতে জেনার সেটি দেখতে গেলেন এবং সিরিঞ্জে করে কিছু পুঁজ নিয়ে এলেন বাড়ীতে। তিনি তখন ভাবছিলেন যদি ঐ পুঁজ টিকার মতো সুস্থ মানুষের দেহে ঢোকানো যায় তবে হয়তো বসন্ত রোগ প্রতিরোধ সম্ভব। কিন্তু সে টিকা তো কারোর দেহে পরীক্ষা করে দেখতে হবে যে তাঁর অনুমান সঠিক কিনা। কে আসবে মৃত্যুভয় তুচ্ছ করে সেই টিকা নিতে?

জেনারের বাড়ীতেই থাকত জেমস ফিলিপ নামের একটি ছেলে। সে স্বেচ্ছায় এগিয়ে এল টিকা নিতে। জেনার দ্বিধা করছেন কিন্তু ছেলেটির অগাধ আস্থা জেনারের ওপর। অগত্যা রাজী হলেন জেনার। গো বসন্তের পুঁজের সামান্য পরিমাণ অংশ প্রবেশ করালেন ছেলেটির দেহে। কদিন পর ছেলেটার এল ধূমজ্বর। টিকা দেবার জায়গায় হল বসন্তের মত একটা গুটি। ক'দিন পর আবার জ্বর ছেড়ে গেল আপনা থেকেই। গুটি শুকিয়ে রয়ে গেল কেবল একটি দাগ মাত্র। এবার জেনার বসন্ত রোগীর দেহ থেকে সংগ্রহ করা বসন্তের জীবাণু প্রবেশ করালেন ছেলেটির দেহে। কিন্তু ছেলেটির বসন্ত হল না। জেনার বুঝতে পারবেন গো-বসন্তের বীজ সামান্য পরিমাণে সুস্থ দেহে প্রবেশ করালে শরীরে বসন্ত রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা গড়ে ওঠে। শুরু হলো আরো পরীক্ষা-নিরীক্ষা। অবশেষে ১৭৯৬ সালে বসন্তের টিকা আবিষ্কৃত হল।

জেনারের পরীক্ষা সফল হলেও ডাক্তাররা মেনে নিতে পারল না জেনারের আবিষ্কারকে। জেনার তখন রয়্যাল সোসাইটিতে তাঁর গবেষণাপত্র পাঠালেন কিন্তু কোনো উৎসাহ পেলেন না তিনি সেখান থেকে। জেনার থেমে রইলেন না। গরীব লোকেদের বসন্তের টিকা দিতে লাগলেন। ফলে টিকা নেওয়া লোকেদের বসন্ত হল না। জেনারের বন্ধু নেপোলিয়নও এগিয়ে এলেন টিকা নিতে। পরবর্তীকালে বসন্ত রোগ আটকাতে এই টিকা দেওয়ার পদ্ধতি চালু হয়ে গেল।

রসায়নের সাংকেতিক ভাষা

জোন্‌স জ্যাকব বার্জেলিয়াস (১৭৭৯-১৮৪৮)

ছোটবেলাতেই বাবা-মাকে হারিয়েছিলেন সুইডিস বিজ্ঞানী বার্জেলিয়াস। ছাত্র পড়িয়ে সেই টাকায় পড়াশোনা করতেন তিনি। তাঁর গবেষণার বিষয়

ছিল ভোল্টীয় তড়িৎ ও বিভিন্ন জৈব পদার্থের ওপর তড়িতের প্রভাব। তড়িৎ শক্তির সাহায্যে বিভিন্ন যৌগ থেকে মৌল পৃথক করার পদ্ধতি সম্পর্কে তিনি ইঙ্গিত দিয়েছিলেন।

কিছু কিছু পদার্থ আছে যেগুলি বিশ্লেষণ করা সম্ভব নয়। এগুলিকে বলে মৌলিক পদার্থ। প্রাকৃতিক অবস্থায় এই মৌলিক পদার্থের সংখ্যা ৭২টি। এই মৌলিক পদার্থের একসময় কোনো প্রতীক চিহ্ন ছিল না। কিছু কিছু গ্রীক বা মিশরীয় প্রতীক চিহ্ন ছিল। মিশরীয় অ্যালকেমিস্টরা মৌলিক পদার্থের চিহ্ন হিসাবে আঁকজোক ব্যবহার করতেন। ফলে রসায়ন শাস্ত্র জটিল হয়ে উঠেছিল। তাই বিজ্ঞানী বার্জেলিয়াস রসায়নকে ভাষার জটিলতা থেকে মুক্ত করার জন্য সাংকেতিক ভাষার প্রচলন করেন।

বার্জেলিয়াস বলেছিলেন প্রতি মৌলের নামের বড় হরফের প্রথম অক্ষর হবে তার প্রতীক চিহ্ন। যেমন কার্বন-C। যদি দুটি মৌলের প্রথম অক্ষর এক হয়ে যায় তবে প্রথম অক্ষরের সঙ্গে পরবর্তী কোনো একটি ছোট হরফের অক্ষর যুক্ত হবে। যেমন ক্যালসিয়াম -Ca। কোবাল্ট-Co। মৌলপদার্থের নামে সর্বত্র ল্যাটিন নাম ব্যবহারের কথাও তিনি বলেন। যেমন—লেডের ল্যাটিন নাম Plumbum, তাই এর প্রতীক চিহ্ন Pb। আয়রনের ল্যাটিন নাম Ferrum তাই প্রতীকচিহ্ন Fe। মৌলের প্রতীক চিহ্ন করে তিনি যৌগের গঠন পদ্ধতিরও নির্দেশ দেন। তিনি বলেন যৌগের অন্তর্গত মৌলগুলির প্রতীক চিহ্ন পর পর বসিয়ে যৌগের সংকেত গঠন করতে হবে। যেমন জলের সংকেত-HOH, কার্বন ডাই অক্সাইডের সংকেত OCO।

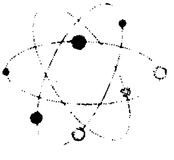

পরমাণুবাদ ও পারমাণবিক ওজনের তালিকা (১৮০৮)

জন ডাল্টন (১৭৬৬-১৮৪৪)

জন ডাল্টনের জন্ম হয় তাঁতীর ঘরে, কিন্তু ছোটবেলা থেকেই তাঁর অঙ্ক, গ্রীক ও ল্যাটিন ভাষায় অসামান্য দক্ষতা ছিল। ডাল্টনের নেশা ছিল আবহাওয়া পর্যবেক্ষণ, এবং তাঁর নিখুঁত ফলাফল লিখে রাখা। এর সাথে বায়ুমণ্ডলের উষ্ণতা, বায়ুর চাপ এবং বৃষ্টিপাতের পরিমাণও তিনি মাপতেন।

১৮০০ সালে ডাল্টন গ্যাসের আংশিক চাপের সূত্র আবিষ্কার করেন। তিনিই প্রথম পরমাণুবাদ আবিষ্কার ও প্রচার করেন। ডাল্টন বলেন প্রতিটি পদার্থ অসংখ্য ছোট ছোট কণার সমষ্টি। ঐ ছোট ছোট কণার নাম তিনি দেন পরমাণু। তিনি বলেন ভিন্ন ভিন্ন মৌলের পরমাণু ওজন ও ধর্মে বিভিন্ন, কিন্তু একই মৌলের পরমাণু ওজন ও ধর্মে একইরকম হয়। তিনি এও বলেন রাসায়নিক বিক্রিয়ায় এই পরমাণুরাই অংশগ্রহণ করেন। বিক্রিয়ার সময় পরমাণুরা পুর্নবিন্যস্ত হয় কিন্তু পরিবর্তিত হয় না। পরমাণু সৃষ্টিও যেমন করা যায় না, তেমনি ধ্বংসও করা যায় না। পরমাণুবাদ আবিষ্কার করার পর তিনি ১৮০৮ সালে মৌলিক পদার্থের পারমাণবিক ওজনের তালিকা তৈরী করেন।

তিনিই প্রথম বলেছিলেন হাইড্রোজেনের পারমাণবিক ওজন-১। ডাল্টনের পারমাণবিক ওজনের তালিকা পুরোপুরি নির্ভূল ছিল না। তাই ১৮২৬ সালে বিজ্ঞানী বার্জেলিয়াস গবেষণা করে নতুন একটি পারমাণবিক ওজনের তালিকা তৈরী করলেন। বর্তমানের পারমাণবিক ওজনের তালিকার সাথে বার্জেলিয়াসের তালিকার পার্থক্য খুবই সামান্য।

আয়োডিন (১৮১১)

বার্নার্ড কোর্টিস

১৮১১ সাল। তখন ফরাসী দেশের শাসনকার্য ফরাসী সম্রাট নেপোলিয়নের হাতে। নেপোলিয়ন ছিলেন যুদ্ধপ্রেমী। দেশের বিজ্ঞানীদের উন্নত ধরণের গোলাবারুদ তৈরীর জন্য তিনি উৎসাহ দিতেন। এই গোলাবারুদ তৈরীর জন্য সোরা খুবই অপরিহার্য। ফরাসী রসায়নবিদ বার্নার্ড কোর্টিস সামুদ্রিক উদ্ভিদ থেকে সোরা পাওয়া যায় কিনা সে নিয়ে পরীক্ষা করছিলেন। কিন্তু বহু পরীক্ষা করেও তিনি সোরা পেলেন না। তার বদলে পেয়ে গেলেন আয়োডিন। যেটি মানবদেহের একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান।

মানুষের দেহে অনেকগুলি গ্ল্যাণ্ড থাকে। গলার সামনে যে গ্ল্যাণ্ড থাকে তাকে বলে থাইরয়েড গ্ল্যাণ্ড। এই গ্ল্যাণ্ডে থাইরয়েড হর্মোন নামে এক ধরনের রস তৈরী হয়। এই রস শরীরের প্রত্যেকটি কোষের কার্যক্ষমতা রক্ষা করে। শরীরে আয়োডিনের পরিমাণ কমে গেলে থাইরয়েড হর্মোনের পরিমাণও কমে যায়।

বিংশ শতাব্দীর প্রথমদিকে মার্কিন বিজ্ঞানী ডেভিড মেরিণ বলেন আয়োডিনের অভাবে থাইরয়েড হর্মোন কমে যাওয়ায় শরীরের কোষ গুলি দুর্বল হয়ে পড়ে তাই গলগণ্ড রোগ হয়।

মানব দেহের দৈনিক এক মিলিগ্রামের দশ ভাগের এক ভাগ আয়োডিন দরকার হয়। এই আয়োডিন পাওয়া যায় ফল,শাক-সব্জী, গরু-মোষের দুধ থেকে।

ডেভির নিরাপত্তা বাতি (১৮১৬)

হামফ্রে ডেভি (১৭৭৮—১৮২৯)

ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমদিকে বিদ্যুৎশক্তি আবিষ্কার হওয়ার আগে বাষ্পশক্তিই ছিল মানুষের একমাত্র ভরসা। এই বাষ্পশক্তির জন্য দরকার হত প্রচুর কয়লা। এছাড়া ধাতু নিষ্কাশনেও কয়লা ব্যবহৃত হত।

কয়লা উত্তোলনের কাজটি ছিল বিপজ্জনক। কয়লাখনি সাধারণত অন্ধকার হয়। কয়লাখনিতে মাঝে মাঝেই ধস্ নামে, ভূগর্ভে সঞ্চিত জলরাশি খাদে ঢুকে পড়ে। এছাড়া খনির সর্বত্র কম বেশী কার্বন ও হাইড্রোজেনের যৌগিক মিথেন গ্যাস বা মার্স গ্যাস থাকে। পচা পুকুরে বা জলাভূমিতে এই গ্যাস আপনা থেকে জন্মায়। তাই এই গ্যাসের নাম মার্স গ্যাস বা জলাভূমির গ্যাস। এই গ্যাসের সঙ্গে বাতাসের মিশ্রণ ঘটলে অতি অল্প তাপমাত্রায় সামান্য আগুন বা তাপের সংস্পর্শে প্রচণ্ড বিস্ফোরণ ঘটে। তাই খনির মধ্যে অন্ধকার দূর করতে কেরোসিনের বাতি বা মোম বাতি ব্যবহার করা যেত না।

খনিতে কাজ করতে গেলে আলো দরকার। অথচ আলো নিয়ে ঢুকলেই বিপদ, শেষপর্যন্ত খনি শ্রমিকদের সুবিধা ও নিরাপত্তা দিতে এগিয়ে এলেন বিখ্যাত বিজ্ঞানী হামফ্রে ডেভি। ১৮১৬ সালে তিনি একটি বাতি আবিষ্কার করলেন, যার নাম দেওয়া হল নিরাপত্তা বাতি। বাতিটি দেখতে অনেকটা কেরোসিন ল্যাম্পের মতো। এবং কেরোসিনের জ্বালানীতেই জ্বলে। বাতিটির প্রধান বৈশিষ্ট্য হল বাতির ওপর যে চিমনি আছে তার উপরিভাগটা তামা বা লোহার তারজালি দিয়ে তৈরী। তামা বা লোহা তাপের সুপরিবাহী। তাই তারের কোনো একটি স্থান তাপে উত্তপ্ত হলে সেই তাপ অতি দ্রুত অন্য

স্থানে পরিবাহিত হয়। তাই বাতি থেকে তাপ নির্গত হয়ে উপরিভাগে তারজালি থাকার জন্য দ্রুত অন্য স্থানে ছড়িয়ে পড়ে। বাইরের মার্স গ্যাসকে কিছুতেই জ্বলনাঙ্কে পৌঁছতে দেয় না। তাই মার্স গ্যাস ও বায়ুর মিশ্রণ বিস্ফোরক হয়েও অগ্নিকাণ্ড ঘটায় না।

এই বাতি জ্বলার জন্য যে বাতাস প্রয়োজন তাও সহজে বাতিতে প্রবেশ করতে পারে। খনির মধ্যে মিথেন গ্যাসের পরিমাণ নির্ণয় করা যায় এই বাতির মধ্য দিয়ে। বাতাসের সঙ্গে যদি মিথেন গ্যাস মিশে থাকে তবে বাতির মধ্যে বাতাস ঢুকলেই বাতিটি নীল শিখায় জ্বলতে থাকে। গ্যাসের পরিমাণটা একটা যন্ত্রের সাহায্যে নির্ণয় করা যায়। গ্যাসের পরিমাণ ধীরে ধীরে বিপদসীমা ছাড়ালেই সর্তকতামূলক ব্যবস্থা নিতে হয়।

ডেভির নিরাপত্তা বাতির বহু উন্নতি পরবর্তীকালে করা হয়েছে। এখন খনির মধ্যে বৈদ্যুতিক বাতি দিয়েই অন্ধকার দূর করা হয়। তবু খনিতে দাহ্য গ্যাসের পরিমাণ নির্ণয়ের জন্য এই বাতি এখনও ব্যবহৃত হয়।

চুম্বক ও তড়িৎ প্রবাহের সম্পর্ক (১৮২০)

হ্যান্স ওরস্টেড

বিজ্ঞানী হ্যান্স ওরস্টেড ছিলেন ডেনমার্কের কোপেনহেগেন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক। ১৮১৯ সালে একদিন বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করার সময় তিনি ক্লাসে তাঁর ছাত্রদের বিদ্যুৎ বিষয়ে কিছু পরীক্ষা করে দেখাচ্ছিলেন। সে সময় টেবিলের ওপর পড়েছিল একটি কম্পাস।

আমরা সকলেই জানি কম্পাসের মধ্যে থাকে একটি চুম্বক শলাকা। এটি সব সময় উত্তর দক্ষিণে প্রলম্বিত থাকে। কেবল চুম্বকের সংস্পর্শে এলেই এই শলাকা দিকপরিবর্তন করে।

কম্পাসের এই স্বাভাবিক বৈশিষ্ট্যের ব্যতিক্রম সেদিন লক্ষ্য করলেন ওরস্টেড। তিনি বিদ্যুৎ বিষয়ে ছাত্রদেরকে একটি পরীক্ষা করে দেখাতে গিয়ে লক্ষ্য করে দেখলেন যে তারের ভেতর দিয়ে বিদ্যুৎপ্রবাহিত হলেই কম্পাসের শলাকাটা নড়ে উঠছে। বিদ্যুৎপ্রবাহ বন্ধ হলেই শলাকার নড়াচড়াও থেমে যাচ্ছে, এবং বিদ্যুৎ যেদিক থেকে প্রবাহিত হচ্ছে কাঁটাটাও সেদিকে ঘুরে যাচ্ছে। প্রবাহ বন্ধ হলে শলাকা স্বাভাবিক অবস্থায় আসছে। ওরস্টেড অবাক হয়ে ভাবলেন একমাত্র চুম্বকই তো কম্পাসের শলাকার দিকপরিবর্তন করতে পারে। কিন্তু বিদ্যুৎ প্রবাহিত হলেই শলাকার দিকপরিবর্তন হচ্ছে কেন?

বারবার একইভাবে পরীক্ষা করে দেখলেন তিনি। ফল হল একই। শেষ পর্যন্ত ওরস্টেড বুঝতে পারলেন কোনো তারের মধ্যে দিয়ে বিদ্যুৎ প্রবাহিত হলে তারটি তখন চুম্বকের কাজ করে। ফলে তড়িৎ প্রবাহিত তারের চারদিকে চৌম্বক ক্ষেত্রের সৃষ্টি হয়। আর সেই চৌম্বক ক্ষেত্রের প্রভাবে চুম্বক শলাকার দিকপরিবর্তন হয়। অর্থাৎ বিদ্যুৎ ও চুম্বকের মধ্যে একটি ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে। তাঁর এই আবিষ্কারের ফলেই পরবর্তীকালে গ্যালভানোমিটার, বিদ্যুৎ চুম্বক প্রভৃতি আবিষ্কৃত হয়।

তড়িৎ প্রবাহের সাহায্যে চৌম্বকত্ব সৃষ্টি (১৮২০)

আঁদ্রে ম্যারী অ্যাম্পিয়ার (১৭৭৫—১৮৩৬)

খুব ছোটবেলায় শিশু আঁদ্রে ম্যারী অ্যাম্পিয়ার নুড়ি-পাথর নিয়ে মনে মনে অঙ্কের সমাধান করতেন। বারো বছর বয়সেই ক্যালকুলাস শিখে নিয়েছিলেন। আঠারো বছর বয়সে শুধুমাত্র ধন-সম্পত্তি থাকার কারণে ফরাসী বিপ্লবের বিপ্লবীরা তাঁর বাবাকে গিলোটিনে হত্যা করে তাঁদের টাকাকড়ি,

জমিজমা, বাড়ি বাজেয়াপ্ত করে। তখন থেকেই ধনীর সন্তান অ্যাম্পিয়ারের শুরু হয় জীবনসংগ্রাম। প্রথমে গৃহশিক্ষকতা, তারপর বছর পাঁচেক মাধ্যমিক স্কুলে শিক্ষকতা করার পর বোর্গ শহরের এক কলেজে অধ্যাপনা শুরু করেন। ১৮০৪ সালে ঊনত্রিশ বছর বয়সে প্যারিসের ইকোল-পলিটেকনিক কলেজে গণিত ও বলবিদ্যা নিয়ে অধ্যাপনা শুরু করেন বাকি জীবনটা সেখানেই কাটিয়ে দেন।

অধ্যাপনার পাশাপাশি পদার্থবিদ্যা, রসায়ন ও গণিতের ওপর বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় তিনি প্রবন্ধ লিখতেন। পদার্থবিদ্যায় মৌলিক গবেষণা করে তড়িৎ ও চুম্বকের মধ্যে সম্বন্ধ আবিষ্কার করে ইলেকট্রোডায়নামিক্স নামে বিজ্ঞানের এক নতুন শাখার জন্ম দেন।

১৮২০ সালের ১১ সেপ্টেম্বর কোপেনহেগেন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ওরেষ্টেড চুম্বকের ওপর তড়িৎ প্রবাহের ফল সম্পর্কে এক নতুন তথ্য আবিষ্কার করেন। তার ঠিক এক সপ্তাহ পরে ১৮ সেপ্টেম্বর প্যারিসের বিজ্ঞান একাডেমীতে অ্যাম্পিয়ার তড়িৎবিজ্ঞানের এক নতুন দিক আবিষ্কার করলেন।

তিনি পরীক্ষা করে দেখান যে একটি ঋজু তারের মধ্য দিয়ে তড়িৎ চালনা করলে ঐ তারের চারদিকে কতগুলি সমকেন্দ্রিক বৃত্তাকার চৌম্বক বলরেখা সৃষ্টি হয়। ঐ বৃত্তগুলির তল তারের তড়িতের অভিমুখের সমকোণে থাকে। ঋজু তারের মধ্য দিয়ে উল্টোদিক দিয়ে তড়িৎ চালনা করলে বলরেখার অভিমুখ উল্টো হয়ে যায়।

তিনি পরীক্ষা করে দেখান দুটি পরিবাহী তার সমান্তরালভাবে কাছাকাছি রাখলে প্রবাহের অভিমুখ অনুযায়ী ওদের ভেতর আকর্ষণ ও বিকর্ষণ বল কাজ করে। দুটো তারের মধ্য দিয়ে যদি একই দিকে তড়িৎ প্রবাহিত হয় তবে দুটো তারে আকর্ষণ হয় আর যদি দুটো তারের মধ্যে তড়িৎপ্রবাহের অভিমুখ পরস্পরের বিপরীত হয় তবে তাদের মধ্যে বিকর্ষণ দেখা যায়।

প্রবাহমাত্রা, দুটি পরিবাহী তারের মধ্যকার দূরত্ব, আকর্ষণ ও বিকর্ষণ বলের প্রাবল্যের মধ্যে যে সম্পর্ক রয়েছে তা বিজ্ঞানী অ্যাম্পিয়ার গাণিতিক সূত্রাকারে দেখান। এভাবে তিনি প্রমাণ করেন চৌম্বকত্ব সৃষ্টির জন্য সবসময়

চুম্বক দরকার হয় না। তড়িৎপ্রবাহেও সেই কাজ করা যায়। চুম্বকের মত তড়িৎ প্রবাহের চারিদিকে নির্দিষ্ট স্থানে চৌম্বকক্ষেত্র সৃষ্টি হয়।

অ্যাম্পিয়ার প্রমাণ করেন তড়িৎ প্রবাহযুক্ত সলিনয়েড দণ্ড চুম্বকের সমধর্ম বিশিষ্ট। (একটি দীর্ঘ অন্তরিত তারকে যদি একটি অন্তরক চোঙের গায়ে চোঙের অক্ষের সঙ্গে অভিলম্ব করে পাক দেওয়া হয়, তবে ঐ কুণ্ডলীকে বলে সলিনয়েড) সলিনয়েডে তারের পাক সংখ্যা বাড়ালে চৌম্বকশক্তি বাড়ে। সলিনয়েডের কোন দিকে কোন্ মেরু তাও দেখান অ্যাম্পিয়ার। এছাড়াও স্থায়ী চুম্বকের চৌম্বকত্ব হয় আণবিক তড়িতের জন্য একথা তিনিই প্রমাণ করেন। তড়িৎ প্রবাহের আণবিকতত্ত্বও তিনি আবিষ্কার করেন। তড়িৎবিজ্ঞানে তাঁর এই কৃতিত্বের জন্য তড়িৎ প্রবাহের ব্যবহারিক এককের নাম রাখা হয় অ্যাম্পিয়ার।

অ্যাম্পিয়ারের আবিষ্কারের ওপর ভিত্তি করে পরবর্তীকালে গড়ে উঠেছে বৈদ্যুতিক ঘন্টা, বৈদ্যুতিক মোটর প্রভৃতি।

কুইনাইন (১৮২০)

পেলটিয়ার ও ক্যাভেলটু

১৬৪০ সালে দক্ষিণ আমেরিকার পেরুর বড়লাট কাউণ্ট অব সিনকোনের স্ত্রীর হল ভীষণ জ্বর। জ্বর আর কিছুতেই কমে না। কাঁপুনি দিয়ে প্রতিদিন জ্বর আসে। কত ডাক্তার, কবিরাজ এল, কিন্তু কেউই জ্বর কমাতে পারে না। কাউন্ট সিনকোন হতাশ হয়ে চোখের সামনে তাঁর স্ত্রীকে তিল তিল করে মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যেতে দেখলেন।

এমন সময় এক আদিবাসী বৃদ্ধ এলেন কাউন্টের কাছে। কাউন্টের জ্বর পরীক্ষা করলেন তিনি। তারপর বুনো উদ্ভিদের ছাল বেটে আরক তৈরী করে কাউন্টেসকে খাইয়ে দিলেন। দুদিনের মধ্যেই কাউন্টেসের জ্বর ছেড়ে গেল। কাউন্টের মুখে আবার ফিরে এল আগেকার হাসি। ঐ আদিবাসী বৃদ্ধ ওযুধ

দিলেও ওষুধের নাম জানায়নি কাউণ্টকে, কেবল বলেছিল যে গাছের ছাল থেকে এই ওষুধ তৈরী হয় সে গাছ পাওয়া যায় এই দক্ষিণ আমেরিকার পেরু অঞ্চলেই। গাছটা শেষপর্যন্ত কাউন্ট খুঁজে বের করেন এবং তাঁরই নামানুসারে ঐ গাছের নাম হয় সিনকোনা। তখনকার দিনে ম্যালেরিয়া জ্বরের একমাত্র ওষুধ ছিল সিনকোনা গাছের ছাল।

দীর্ঘদিন পরে ১৮২০ সালে বিজ্ঞানী পেলটিয়ার ও ক্যাভেলটু সিনকোনার শুকনো ছাল থেকে কুইনাইন নামের এক ওষুধ আবিষ্কার করেন।

ডায়নামো (১৮২১)

মাইকেল ফ্যারাডে (১৭৯১—১৮৬৭)

বৈজ্ঞানিক হওয়ার আগে বই বাঁধানোর দোকানে কাজ করতেন মাইকেল ফ্যারাডে। কাজ করতে করতেই পড়ে ফেলতেন বিদ্যুৎ ও রসায়ন সম্পর্কিত বই। একদিন হঠাৎ ফ্যারাডের হাতে এল বিজ্ঞানী হামফ্রে ডেভির বক্তৃতা সভার একটি টিকিট।

বিখ্যাত বিজ্ঞানী হামফ্রে ডেভির বক্তৃতা শুনতে শুনতে তার সারাংশ টুকে নিয়েছিলেন তিনি। এই বক্তৃতা শুনে তাঁর মনে হয়েছিল রয়্যাল ইন্সটিটিউশনে একটা কাজ পেলে ও বিজ্ঞানের কাজে নিজেকে উৎসর্গ করতে পারলে ধন্য হবে তাঁর জীবন। কিন্তু সেই ইন্সটিটিউশনে কাজ পাওয়া কি সহজ কথা! অনেক চেষ্টা করেও কোনো পথ না পেয়ে অগত্যা একটি চিঠি ও তার সাথে ডেভির বক্তৃতার সারাংশটি তিনি পাঠিয়ে দিলেন হামফ্রে ডেভির ঠিকানায়। ডেভি ফ্যারাডেকে চিনতে ভুল করেননি। তাই আমরা ফ্যারাডের কাছ থেকে পেলাম ডায়নামো। যা চালিয়ে তৈরী করা যায় প্রচুর শক্তিশালী বিদ্যুৎ।

১৮২০ সালে ডেনমার্কের বিজ্ঞানী ওরস্টেড সর্বপ্রথম আবিষ্কার করেন বিদ্যুতের সঙ্গে চুম্বকের ঘণিষ্ঠ সম্পর্ক আছে। একটা তামার তারে বিদ্যুৎ প্রবাহিত করে সেটি কম্পাসের চুম্বক শলাকার ওপর ধরলে শলাকাটির মুখ ঘুরে যায়। অর্থাৎ বিদ্যুৎসঞ্চার ক্ষেত্রে চুম্বকশক্তির সৃষ্টি করা যায়। এই আবিষ্কারের থেকে ফ্যারাডের মনে হয় তাহলে চুম্বক থেকেই বা বিদ্যুৎ প্রবাহিত করা যাবে না কেন?

১৮২৯ সালে ফ্যারাডে একটি লম্বা তারকে সিলিণ্ডারের আকারের একটা পিচবোর্ডের চারপাশে জড়ালেন। তারের দুপ্রান্তে বিদ্যুৎ প্রবাহ মাপার যন্ত্র গ্যালভানোমিটার লাগালেন। সিলিণ্ডারের ভেতর রাখলেন একটা চুম্বক দণ্ড। এই চুম্বক দণ্ডটি নাড়াতেই তিনি দেখলেন বিদ্যুতের সৃষ্টি হচ্ছে। চুম্বকটা জোরে নাড়ালে বিদুৎ প্রবাহও জোরালো হতে থাকে। এর ফলে তিনি আবিষ্কার করলেন যে তত্ত্ব তার নাম হল 'তড়িৎ চুম্বকীয় আবেশ'।

ঐ সালেরই ১৭ অক্টোবর রয়্যাল সোসাইটিতে তিনি একটি লোহার রিং-এর ওপর তার জড়িয়ে সর্বপ্রথম বিদ্যুৎ চুম্বকীয় আবেশ পরীক্ষা করে দেখালেন। তাঁর এই তত্ত্বের ওপর ভিত্তি করেই তিনি একটি অশ্বক্ষুরাকৃতি চুম্বক নিয়ে তার দুই মেরুর মাঝখানে একটি তামার তারের কুণ্ডলি এমন ভাবে রাখলেন যাতে চুম্বকের গায়ে সেটি না ঠেকে যায়। তারের এই কুণ্ডলীকে বলে আর্মেচার। এই আর্মেচারের সাথে জলপ্রবাহ চালিত কাঠের চাকা জুড়ে দিয়ে আর্মেচার ঘোরাতে থাকলেই বিদ্যুৎ উৎপন্ন হতে থাকে। এই আর্মেচারকে বাষ্প, জলপ্রবাহ আর গ্যাসের সাহায্যেও ঘোরানো যায়।

ডায়নামো আবিষ্কারের ফলে পরবর্তীকালে ইলেকট্রিক মোটর, ট্রান্সফর্মার প্রভৃতি বৈদ্যুতিক যন্ত্র আবিষ্কার সম্ভব হয়েছে।

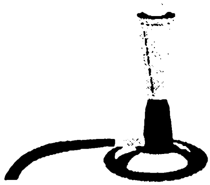

গ্যাসের আলো

উইলিয়ম মার্ডক

ইলেকট্রিক আলো যখন আবিষ্কৃত হয়নি তখন শহর আলোকিত হত গ্যাসের আলোতেই। গ্যাসের আলো বর্তমানে ব্যবহার হয় ল্যাবরেটারিতে। এই গ্যাসের আলো আবিষ্কার করেছিলেন উইলিয়ম মার্ডক।

মার্ডক ছিলেন খুবই গরীব ঘরের ছেলে। পেটের তাগিদে ছোটবেলা থেকেই গরু চরাতে যেতে হত। আর সন্ধ্যে হলেই ছোট্ট মার্ডক যন্ত্রপাতি নিয়ে বসতেন টুকিটাকি জিনিস বানাতে। বড় হতেই মার্ডক ভাবলেন কারখানায় শিক্ষানবীশ হবেন। জুটেও গেল একটা কারখানার কাজ। কাজ পাগল ছেলে মার্ডক দুদিনেই কারখানার মালিকের মন কেড়ে নিলেন। এদিকে টুকিটাকি বানানোর নেশা যায় নি মার্ডকের। বাড়ী এসেই ডুবে যেতেন কাজে, কিন্তু ঘরে তো কেবল মোমবাতি আর লণ্ঠনের আলো। বড় অসুবিধা হয় কাজ করতে। তিনি ভাবলেন আলো পাওয়ার একটা উপায় খুঁজতে হবে। উপায়ের কথা ভাবতে ভাবতে তাঁর মনে হল কয়লাকে যখন পোড়ানো হয় তখন যেমন তাপ হয় তেমনি আলোও হয়। তার সাথে প্রচুর ধোঁয়াও বের হয়। এই ধোঁয়াকে কি জ্বালানো সম্ভব? পরীক্ষায় বসে গেলেন তিনি।

একটা কেটলি কয়লা ভর্তি করে উনুনে বসালেন। কেটলির বড় মুখটা ঢাকা দিয়ে দিলেন। কেটলির নলের সাথে জুড়ে দিলেন একটা রাবারের নল। সেই নলের শেষ প্রান্তটা একটা মোটা ধাতব চোঙের মধ্যে ঢুকিয়ে দিয়ে বায়ু নিরুদ্ধ করে দিলেন। চোঙের অপর দিকে আরেকটা রাবারের নল লাগিয়ে সেই নলের শেষপ্রান্তে একটা শোলার ছিপি. দিয়ে আটকে সেই ছিপিতে একটা ছোট্ট ফুটো করে দিলেন।

কয়লা গরম হয়ে যেতেই ছোট ফুটো দিয়ে জোরে গ্যাস বের হতে লাগল। একটা দেশলাই কাঠি জ্বালিয়ে ঐ গ্যাসের সামনে ধরলেন মার্ডক।

অমনি দপ্ করে জ্বলে উঠল আলো। কি উজ্জ্বল সেই আলো।

মার্ডক সকলকে জানাতে লাগলেন তাঁর আবিষ্কারের কথা। বিখ্যাত বিজ্ঞানী ডেভির কাছে গেলেন মার্ডক। মার্ডক বললেন, 'এই আলো দিয়ে আমি গোটা লণ্ডনকে আলোকিত করতে পারি।' কিন্তু ডেভি তাঁর কথার গুরুত্ব দিলেন না। মার্ডক তখন তাঁর পরিকল্পনার কথা জানালেন কারখানার মালিককে। মালিকের অর্থসাহায্যে খুব গোপনে মার্ডক সবকিছু যোগাড় করলেন। তারপর একদিন রাত্রে সকলে বিস্ময়ে দেখল মার্ডকের আবিষ্কৃত গ্যাসের আলোয় লণ্ডন ঝলমল করছে।

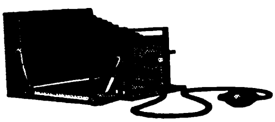

ফটোগ্রাফ (১৮২৪)

নিয়ৎস্ ভ্রাতৃদ্বয় ও দ্যা গোরে

সর্বপ্রথম ইওরোপের বৈজ্ঞানিকরা রাসায়নিক বস্তুর ওপর সূর্যরশ্মির প্রতিক্রিয়া বিষয়ে গবেষণা শুরু করেছিলেন। এই গবেষণা চালাতে গিয়ে ১৭২৯ সালে হঠাৎই একদিন এক জার্মান বিজ্ঞানী John Schulze আবিষ্কার করলেন যে সিলভার ক্লোরাইডের দ্রবণকে সূর্যালোকে রেখে দিলে সেটি সূর্যালোক সহ্য করতে না পেরে কালো হয়ে যায়। অর্থাৎ তার বর্ণ পরিবর্তন করে। এই আবিষ্কারের পর থেকেই সেনসিটিভ ফিল্ম তৈরীতে সিলভার ক্লোরাইড, সিলভার ব্রোমাইড, সিলভার আয়োডাইড প্রভৃতি ব্যবহৃত হত।

বৈজ্ঞানিক স্যার হামফ্রে ডেভি এই গবেষণাকেই ভিত্তি করে দেখলেন যে, সাদা কাগজ সিলভার নাইট্রেটে ভিজিয়ে তার ওপর কোনো বস্তুর ছায়া ফেললে ছায়াটি কিছুক্ষণের জন্য কাগজে রয়ে যায়। তিনি দীর্ঘদিন গবেষণা চালিয়েছিলেন এই ছায়াটিকে দীর্ঘস্থায়ী করার জন্য, কিন্তু সফল হননি।

ডেভির এই তথ্যকে ভিত্তি করেই স্থায়ীভাবে কোন ছায়াছবিকে ধরে রাখতে সক্ষম হলেন নিয়েপস্ পরিবারের দুই ভাই। তাঁরা ছিলেন শিল্পী। তাঁরা একদিন একটা কাগজে ছবি এঁকে তার উল্টো পিঠে বার্ণিশ মাখিয়ে

কাগজটিকে স্বচ্ছ করে নিলেন, তারপর একটা সিলভার প্লেটে বিটুমেন লাগিয়ে তার ওপর ছবিটা রেখে সূর্যালোকে রেখে দিলেন। দেখা গেল কাগজের যে অংশগুলো বার্নিশ মাখিয়ে স্বচ্ছ হয়ে উঠেছিল, সেখান দিয়ে সূর্যরশ্মি ঢুকে বিটুমেনের প্রলেপের সেই জায়গাগুলি শক্ত করে দিয়েছে, ফলে ঐ আঁকা ছবির প্রায় অবিকল প্রতিকৃতি ফুটে উঠেছে সিলভার প্লেটের গায়ে। তাঁরা এবার বিটুমিনের প্রলেপ লাগানো নরম অংশটি ল্যাভেণ্ডার তেল দিয়ে তুলে ফেললেন। তারপর শক্ত বিটুমিনের অংশটি তুলে ফেলে সিলভার প্লেটে কালি ঘষে কাগজে ছাপ তুলে নিলেন। ফলে আঁকা ছবির প্রতিকৃতি ফুটে উঠল কাগজে। বিটুমিনের বদলে প্লেটে আয়োডিনের প্রলেপ লাগিয়েও তাঁরা কিছুটা পরিষ্কার ছবি পাওয়ার চেষ্টা চালিয়েছিলেন। সব থেকে পরিষ্কার ছাপ উঠলো প্লেটে পারা লাগিয়ে।

এবার তাঁরা চেষ্টা করলেন ক্যামেরার মাধ্যমে মানুষের ছবি তুলে তাকে দীর্ঘস্থায়ী করে রাখতে। নিয়েপস্ দুই ভাইয়ের সাথে এবার যোগ দিলেন বিজ্ঞানী দ্যাগোরে। শেষপর্যন্ত ১৮২৪ সালে ক্যামেরায় মানুষের ছবি তোলা সম্ভব হল। তবে এই পদ্ধতিতে ছবির কেবলমাত্র পজিটিভ হত। একাধিক ছবি করা যেত না। যে ব্যক্তির ছবি তোলা হবে তাকে দীর্ঘক্ষণ রোদে বসে থাকতে হত।

এরপর উইলিয়াম ফক্স ট্যালবট নামক এক ইংরেজ বিজ্ঞানী ফটোর জন্য যে কাগজকে ব্যবহার করা হবে তাকে প্রথমে নুন জলে ভিজিয়ে শুকিয়ে নিয়ে তারপর সিলভার নাইট্রেটের দ্রবণ মাখিয়ে সেটি ক্যামেরার মধ্যে রেখে ছবি তুললেন। ছবি তোলা হয়ে গেলে আবার সেটিকে নুন জলে ধুয়ে পেলেন একটি স্থায়ী নেগেটিভ। এই নেগেটিভ থেকেই যত ইচ্ছা পজিটিভ করে নেওয়া গেল। এই পদ্ধতির নাম দেওয়া হল ফটোগ্রাফী। এই পদ্ধতিতে নেগেটিভ থেকে সঙ্গে সঙ্গে পজিটিভ করে নিতে হত। না হলে পরিষ্কার ছবি পাওয়া যেত না।

পরবর্তীকালে এই অসুবিধা দূর করার জন্য ম্যাডক্স নামক এক ফটোগ্রাফার ১৮৭১ সালে দ্রবীভূত জিলেটিনের সঙ্গে ব্রোমাইড লবণ ও সিলভার নাইট্রেট মিশিয়ে সেটাকে একটি কাচের প্লেটের গায়ে লাগিয়ে শুকিয়ে নিয়ে সেটি

ক্যামেরার মধ্যে রাখলেন, ফলে ছবি তোলা হলে ঐ প্লেটে নেগেটিভ উঠল। এবং সঙ্গে সঙ্গেই ডেভলপ করে নেবার প্রয়োজন রইল না।

জর্জ ইস্টম্যান তাঁর কোডাক ক্যামেরা আবিষ্কার করে ফটোগ্রাফীর আরো উন্নতি সাধন করলেন। তাঁর ক্যামেরায় জড়ানো ছিল একটি সেনসিটিভ কাগজ, যাতে বহু সংখ্যক ছবি তোলা যেত।

পরবর্তীকালে অবশ্য ক্যামেরা, লেন্স, ফিল্ম, ফটোগ্রাফীর কাগজ, প্লেট সব কিছুরই পরিবর্তন ঘটেছে, এবং শুধু কোনো ব্যক্তি বা দৃশ্যের ছবি তোলাই নয় বিজ্ঞান, চিকিৎসা, সিনেমা নানা ক্ষেত্রে ফটোগ্রাফী ব্যবহৃত হচ্ছে।

ইউরিয়া (১৮২৮)

ফ্রেডরিক ভোলার

একসময় বিজ্ঞানীদের ধারণা ছিল যৌগিক পদার্থের মধ্যে কেবলমাত্র অজৈব যৌগিক পদার্থকেই রসায়নাগারে তৈরী করা যায়।

কিন্তু ১৮২৮ সালে জৈব যৌগ ইউরিয়াকে যখন রসায়নাগারে প্রস্তুত করা গেল তখন বিজ্ঞানীদের আগের ভ্রান্ত ধারণা ভেঙে গেল।

ডাঃ ফ্রেডরিক ভোলার জার্মানীর হেইডেলবার্গে চিকিৎসাবিদ্যা নিয়ে পড়াশোনা করেছিলেন। কিন্তু ডাক্তার হয়েও রসায়নবিদ্যা চর্চা ও গবেষণা করেই কাটিয়েছিলেন সারা জীবন। ডাক্তারী পড়ার সময় তিনি মানুষের মূত্র বিশ্লেষণ করে তার থেকে ইউরিয়া নামক একটি জৈব যৌগকে পেয়েছিলেন। সেটির রঙ সাদা, আকৃতি সূঁচের মতো স্ফটিকাকার।

১৮২৮ সালে তিনি বিশ্ববিখ্যাত সুইডিস রসায়ন বিজ্ঞানী বার্জেলিয়াসের রসায়নাগারে অজৈবযৌগ নিয়ে গবেষণা করছিলেন। একদিন সায়ানিক অ্যাসিডের সঙ্গে অ্যামোনিয়া মিশিয়ে অ্যামোনিয়াম সায়ানেট নামক যৌগিক পদার্থ তৈরী করে পরীক্ষা করছিলেন। পরীক্ষা করতে গিয়ে পদার্থটি গরম করতেই তিনি পেলেন নতুন একটি যৌগ। যৌগটির রঙ সাদা, আকৃতি

ছুঁচের মতো, স্ফটিকাকার। গন্ধ ইউরিয়ার মতো। তিনি ভাবলেন পদার্থটিও কি তবে ইউরিয়া? কিন্তু ইউরিয়া তো জৈব যৌগ, এবং তাঁর ধারণা ছিল জৈব যৌগকে অজৈব যৌগ থেকে তৈরী করা যায় না। তিনি পদার্থটির ভৌত ও রাসায়নিক ধর্ম আরেকবার বিশ্লেষণ করে দেখলেন।

নিঃসন্দেহ হওয়ার জন্য ডাক্তারী পড়ার সময় যেভাবে মূত্র থেকে ইউরিয়া তৈরী করেছিলেন সেভাবে ইউরিয়া তৈরী করে রসায়নাগারে প্রস্তুত ঐ পদার্থ ও মূত্র থেকে প্রস্তুত ইউরিয়া দুটিতেই আলাদাভাবে সমপরিমাণ নাইট্রিক অ্যাসিড ঢাললেন। দুটিতেই একই পরিবর্তন দেখা গেল। তিনি বুঝলেন জৈব যৌগকেও অজৈব যৌগের মত রাসায়নাগারে তৈরী করা যায়। তাঁর এই আবিষ্কারের ফলেই কৃত্রিমভাবে জৈব যৌগ তৈরীর পথ খুলে গেছে।

বাষ্পচালিত রেলগাড়ী (১৮৩০)

জর্জ স্টিফেনসন (১৭৮১—১৮৪৮)

প্রথম যখন মানুষ বাষ্পীয় ইঞ্জিনের সাহায্যে গাড়ী চালানোর চেষ্টা করেছিল তখন সকলে সে ঘটনাকে সহজে মেনে নিতে পারেনি। সেরকমই ঘটনা ঘটেছিল ফ্রান্সের এক ইঞ্জিনিয়ার নিকোলাস কুনো এবং ইংলণ্ডের এক ইঞ্জিনিয়ার উইলিয়াম মাডরকের ক্ষেত্রে।

ফ্রান্সে নিকোলাস কুনো একটি তিন চাকার গাড়ী আবিষ্কার করে গাড়ীর পেছনে বয়লার রেখে সেটার বাষ্পকে চাকা ঘোরানোর কাজে লাগিয়েছিলেন। ঘন্টায় চারমাইল গতিবেগে সে গাড়ী চালিয়েও ছিলেন তিনি। কিন্তু বাষ্পীয় শক্তিকে রাস্তার ওপর ব্যবহার করা সহজসাধ্য ছিল না। কারণ তখনকার দিনে রাস্তা তত উন্নতও ছিল না। ফলে একদিন নিকোলাসের গাড়ী চালাতে গিয়ে ঘটল দুর্ঘটনা। শেষপর্যন্ত সরকার কুনোর গাড়ির ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করে দিলেন।

কুনোর ইঞ্জিনের চেয়ে উন্নত ছিল উইলিয়ম মাডরকের ইঞ্জিন। কিন্তু বাষ্পীয় শক্তিতে চালানো গাড়ীর প্রতি মানুষের ভয় এবং ইঞ্জিনের প্রচণ্ড শব্দের জন্য তাঁর প্রচেষ্টাও বন্ধ রাখতে হল।

কিন্তু বাষ্পীয় শক্তিকে কাজে লাগাবার জন্য গবেষণা থেমে রইল না। বাষ্পীয় শক্তিকে কাজে লাগিয়ে রেল গাড়ীর ইঞ্জিন তৈরীর কথা প্রথম ভাবলেন ইংলণ্ডের নিউ ক্যাসেলের এক কোলিয়ারীর ফায়ারম্যানের ছেলে জর্জ স্টিফেনসন। জর্জের বাবার রোজগার খুব কম ছিল তাই ছোটবেলাতেই জর্জকে স্কুল ছেড়ে যেতে হয়েছিল কয়লাখনির কয়লা থেকে পাথর কুড়োনোর কাজে। তবু সে স্বপ্ন দেখত সে হয়েছে ইঞ্জিনের চালক। বইপত্র পড়ার সুযোগ না থাকলেও কয়লাখনির ইঞ্জিন দেখে ইঞ্জিন সম্পর্কে অনেক কথাই জর্জ জেনে ফেলে ছিল। এসময় বাষ্পীয় ইঞ্জিন সম্পর্কে তার আগ্রহ জন্মায়। কিন্তু এজন্য দরকার পড়াশোনা। তাই একটু বড় হতে জর্জ ভর্তি হলেন নাইট স্কুলে। পড়াশোনার ফাঁকে ফাঁকে বাষ্পীয় ইঞ্জিনের যন্ত্রাংশ ও তার কার্যকারিতা সম্পর্কে জানার জন্য খনির যন্ত্রটি নিয়ে নাড়াচাড়া করতেন।

একদিন জর্জ শুনলেন কর্নওয়েলের একজন লোক এমন একটি ইঞ্জিন তৈরী করেছে যেটি রাস্তার ওপর দিয়ে যেতে পারে। নিউক্যাসেলের কোলিয়ারীর ম্যানেজার সেই ইঞ্জিন কিনলেন তাঁর কোলিয়ারীর কয়লা বয়ে নিয়ে যাবার কাজে। জর্জ দেখলেন সেই ইঞ্জিনটাকে। কিন্তু ইঞ্জিনটা বেশী দিন স্থায়ী হল না। জর্জ বুঝলেন এমন ইঞ্জিন বানাতে হবে যা শক্তিশালী ও দীর্ঘস্থায়ী। শেষপর্যন্ত ১৮১৪ সালে 'মাইলর্ড' নামে একটি ইঞ্জিন তিনি তৈরী করলেন এবং একটি গাড়ী তৈরী করে তার সাথে সেই ইঞ্জিনটাকে জুড়ে দিলেন। ঐ বছরই যে লাইনের ওপর দিয়ে কোলিয়ারীর লোকেরা গাড়ী ঠেলে নিয়ে যেতো সেই লাইনের ওপর দিয়ে মাইলর্ড ৫০০ মণ কয়লা নিয়ে ঘন্টায় চার মাইল বেগে ছুটতে লাগল।

এর মধ্যে অনেক দিন কেটে গেছে। স্টকটন থেকে ডারলিংটনে দ্রুত কয়লা সরবরাহের জন্য মিঃ পীস নামের এক ব্যক্তি রেলপথ বানাতে জর্জের সাহায্য চাইলেন। জর্জের সহযোগিতায় খুবই তাড়াতাড়ি পাতা হলো লাইন।

১৮২৪ সালে পাঁচশ' জন্য যাত্রীসহ আটত্রিশখানা বগি জুড়ে তাতে রেল ইঞ্জিন যুক্ত করে জর্জ নিজে চালালেন ঘন্টায় বারো মাইল গতিবেগের বিশ্বের

প্রথম ট্রেনটিকে। এই রেললাইন ছিল বারো মাইল লম্বা। জর্জ এরপর ভাবতে লাগলেন লিভারপুল থেকে ম্যাঞ্চেস্টারের মধ্যে রেল যোগাযোগের কথা। কিন্তু অনেকেই তাঁর এই পরিকল্পনায় বাধা দিতে লাগলেন। বিপক্ষের লোকেরা বললেন রাস্তায় ইঞ্জিন চলাচল করলে গ্রামগুলো পুড়ে যাবে। জন্তু-জানোয়ার কাটা পড়বে, মাঠে ফসল হবে না প্রভৃতি। কিন্তু স্টিফেনসন বিপক্ষদের সাথে কোনো ঝগড়ায় নিজেকে না জড়িয়ে গোপনে চাঁদের আলোয় শুরু করলেন তাঁর কাজ। এর মধ্যে ১৮২৯ সালে তাঁর 'রকেট' নামের রেল ইঞ্জিন প্রতিযোগিতায় পুরস্কার পেলো। শেষপর্যন্ত পার্লামেন্ট জর্জকে রেলগাড়ী চালানোর অনুমতি দিলেন।

স্টিভেনসনের রেলইঞ্জিন

১৮৩০ সালে ১৫ সেপ্টেম্বর রেলগাড়ী নতুন রেলপথ দিয়ে চলল। উদ্বোধন করতে এলেন ওয়েলিংটনের ডিউক ও প্রধানমন্ত্রী স্যার রোবার্ট পীল। নতুন রেলগাড়ী বারোশো মানুষ নিয়ে যাতায়াত করল। এরপর রেলগাড়ী যেতে লাগল দূরদূরান্তে। পৃথিবীর মানুষ জর্জ স্টিফেনসনকে রেলগাড়ীর আবিষ্কারক হিসেবে জানাল স্বতঃস্ফূর্ত অভিনন্দন।

কম্পিউটার (১৮৩৪)

চার্লস বাবেজ (১৭৯১-১৮৭১)

ইংরেজ গণিতজ্ঞ চার্লস বাবেজ একবার তাঁর এক বন্ধুর সঙ্গে জটিল একটি অঙ্কের সমাধান করার চেষ্টা করছিলেন। অঙ্কটি এতই জটিল যে তাঁরা ক্রমশঃই ক্লান্ত হয়ে পড়ছিলেন, তাঁদের ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটছিল। সেদিনই চার্লস বাবেজের মাথায় একটি গণনার যন্ত্র তৈরী করার ভাবনা আসে।

ছোটবেলা থেকেই চার্লস বাবেজের অঙ্কের প্রতি প্রচণ্ড টান ছিল। ভোর তিনটে থেকে উঠে তিনি অঙ্কের সমাধান করতেন। বিজ্ঞান আর প্রযুক্তি বিদ্যার প্রতিও তাঁর আকর্ষণ ছিল, শুধু তাই নয় অর্থনীতি, সমাজবিজ্ঞান, প্রভৃতি বিষয়ের ওপরও তাঁর দক্ষতা ছিল।

১৮১৯ সালে প্যারিসে গিয়ে তিনি এমন একটি গণনা যন্ত্র তৈরীর কথা ভাবতে শুরু করেন যা দিয়ে বিভিন্ন ধরণের অঙ্ক বিভিন্নভাবে সমাধান করা যাবে। এজন্য তিনি গণনা যন্ত্রে সূক্ষ্ম ও বিস্তৃতভাবে তথ্য সংরক্ষণ করতে থাকেন এবং একটি যন্ত্রের মডেল তৈরী করেন। নাম দেন 'ডিফারেন্স ইঞ্জিন'।

ডিফারেন্স ইঞ্জিনটিকে পুরোপুরি সম্পূর্ণ বলা যায় না। এটি লণ্ডনের বিজ্ঞান যাদুঘরে রাখা আছে। ১৮৩৪ সালে ব্রিটিশ সরকার বাবেজকে কিছু অর্থ সাহায্য দিয়ে যন্ত্রটিকে সম্পূর্ণ করতে বলেন। শেষপর্যন্ত তৈরী হয় অ্যানালিটিক্যাল ইঞ্জিন। এটি হল আধুনিক কম্পিউটাররেরই অনুরূপ। এই যন্ত্রটি এমনভাবে তৈরী করা হয়েছিল যাতে বহু জটিল অঙ্ক এর সাহায্যে করা যেত। এই অঙ্কে র সমাধানগুলিকে যন্ত্রটি স্মৃতিতে ধরে রাখতেও পারত। যদিও এই যন্ত্র কখনই কার্যকরী হয়নি। আধুনিক কম্পিউটার কাজ করে বিদ্যুৎশক্তির প্রভাবে। ইলেকট্রনিক মেশিন দিয়ে কম্পিউটারের কাজ শুরু

হয়েছিল ১৯৪০ সালে। আমেরিকায় প্রথম ইলেকট্রনিক কম্পিউটার 'এনিয়াক' তৈরী হয়েছিল ১৯৪৬ সালে। এটি সেকেণ্ডে পাঁচ হাজার গণনা করে দিত, তবে এই যন্ত্র তথ্য বা নির্দেশ সংরক্ষণ করতে পারত না। তাই যন্ত্রটিকে ঠিক কম্পিউটার বলা যায় না।

ম্যাঞ্চেষ্টার বিশ্ববিদ্যালয়ে ১৯৪৮ সালের ২১ জুন পৃথিবীর প্রথম কম্পিউটার প্রায় পঞ্চাশ মিনিট ধরে কাজ করেছিল। এই যন্ত্রের নাম দেওয়া হয়েছিল মার্ক ওয়ান। এটি এক সেকেণ্ডে মাত্র আটশো গণনা করতে পারত, অর্থাৎ এনিয়াকের মত অত দ্রুত ছিল না। কিন্তু এই যন্ত্রে গণনার জন্য তথ্য সংরক্ষণ করার ক্ষমতা ছিল।

কম্পিউটার অবিশ্বাস্য দ্রুতগতিতে কাজ করতে পারে, আধুনিক কম্পিউটার পনের অঙ্ক বিশিষ্ট দুটো সংখ্যা যোগ করে এক সেকেণ্ডের লক্ষ্যভাগের এক ভাগ সময়ে। এই যন্ত্রের স্মৃতিশক্তি অসাধারণ, নির্ভুলভাবে কোনো তথ্য বিশ্লেষণ করতে পারে এই যন্ত্র। এই যন্ত্রকে কোনো কিছু বুঝিয়ে দিলে সে নিজেই তার নানা সমাধান করতে পারে।

কম্পিউটারে রয়েছে ইনপুট সিস্টেম বা আগম ব্যবস্থা। কোনো সমস্যা সমাধানের জন্য যা যা তথ্যের প্রয়োজন হয় তা প্রথমে এই ইনপুট ইউনিটে জমা করা হয়। সাজানো সাংকেতিক তথ্যগুলিকে বলে প্রোগ্রাম। তথ্য সংরক্ষণের জন্য রয়েছে মেমরি বা স্মৃতিবিভাগ। সমস্যার সমাধান বেরিয়ে আসার পদ্ধতিকে বলে আউটপুট বা নির্গম বিভাগ। প্রোগ্রাম তৈরী করে দেবার পর কম্পিউটার তার প্রোসেসিং ও কন্ট্রোল ইউনিট দিয়ে কাজ করতে শুরু করে। কন্ট্রোল ইউনিট ও গণনা বিভাগকে এক সাথে বলে সেন্ট্রাল প্রোসেসিং ইউনিট।

কম্পিউটারকে ট্রেনের টিকিট কাটা, আবহাওয়ার খবর, অর্থনৈতিক পরিস্থিতি, নির্বাচনের ফলাফল, কারখানার জটিল কর্মপদ্ধতি, পারমাণবিক শক্তিকেন্দ্র পরিচালনা, মহাকাশ অভিযান, যুদ্ধের নানা কাজে ব্যবহার করা হচ্ছে।

কম্পিউটারকে বই অনুবাদ করতে, দাবা খেলাতে, প্লেন ও মোটর চালাতেও শেখানো হচ্ছে। কম্পিউটার করতে পারেনা এমন কোনো কাজ নেই।

টেলিগ্রাফ (১৮৩৫)

স্যামুয়েল মোর্স (১৭৯১—১৮৭২)

বর্তমান যুগের নিত্যসঙ্গী টেলিগ্রাফ আবিষ্কার করেছিলেন — না, কোনো বিজ্ঞানী নয়, এক চিত্রকর। নাম তাঁর স্যামুয়েল এফ বি মোর্স। আমেরিকায় ছবি আঁকার জন্য খুব নাম-ডাক ছিল তাঁর। ছবি আঁকার জন্যই বেরিয়েছিলেন ইউরোপ ভ্রমণে। কিন্তু ১৮৩২ সালে লণ্ডন থেকে আমেরিকায় ফেরার জন্য 'সালী' জাহাজে উঠে ফরাসী ডাক্তার জ্যাকসনের সঙ্গ পেয়ে তাঁর জীবনে ঘটে গেল এক বিরাট পরিবর্তন।

পেশায় ডাক্তার হলেও জ্যাকসন সময় পেলেই পড়তেন তড়িৎ-বিজ্ঞান সম্পর্কিত বই। ১৮২১ সালে মাইকেল ফ্যারাডে তড়িৎ-চুম্বকীয় আবেশ আবিষ্কার করেছিলেন। জ্যাকসন স্যামুয়েল মোর্সকে বলতে লাগলেন এই তড়িৎ চুম্বকীয় আবেশের কথা। বিদ্যুৎ প্রবাহিত করলে লোহার তার চুম্বক হয়ে যায় এই কথা শুনে স্যামুয়েল মোর্স চমকে উঠে বললেন 'লোহার তার যদি খুব বড় হয় তাহলে কি বিদ্যুৎ যেতে বেশী সময় লাগবে?' জ্যাকসন বললেন, 'তার লম্বা হলেও বিদ্যুৎ যেতে বেশী সময় লাগবে না।'

স্যামুয়েল তখন জিজ্ঞাসা করলেন 'যদি বিদ্যুৎ পাঠানো যায় তাহলে শব্দকেও তো পাঠানো যেতে পারে?' জ্যাকসন বললেন, 'নিশ্চয়ই, আপনিই চেষ্টা করে দেখুন না।'

মোর্স দেশে ফিরে চিত্রশালাটাকেই গবেষণাগার করে নিলেন। তুলি, কাগজ সরে গিয়ে চলে এল লোহার তার, চুম্বক, ব্যাটারি প্রভৃতি। বন্ধু বান্ধবদের সঙ্গে দেখাশোনা করার সময় নেই তাঁর। সবাই তাঁকে ঠাট্টা করতে লাগলেন। জমানো সব টাকা ফুরিয়ে গেল যন্ত্রপাতি কিনতে। ছবি বিক্রি করে গবেষণার টাকা যোগাড় করতে লাগলেন। এ সময়ই নিউইয়র্ক বিশ্ববিদ্যালয়ের ডাঃ গেল-এর মাধ্যমে বিদ্যুত চুম্বক আবিষ্কারক বৈজ্ঞানিক যোশেফ হেনরীর সাথে পরিচয় হল মোর্সের। 'টরে টক্কা' এই দুটি শব্দ দিয়ে 'মোর্স কোড' আবিষ্কার করে ফেললেন মোর্স। তারপর একটা লোহার টুকরোকে ঘোড়ার নালের মত বাঁকিয়ে তাতে তামার তার জড়িয়ে তার ওপর সুতো দিয়ে বেশ

করে জড়িয়ে অন্যান্য যন্ত্রগুলি রেখে বিদ্যুৎ প্রবাহিত করে মোর্স কোডকে দূরে পাঠাতে পারলেন। কিন্তু তিনি আরো দূরে মোর্স কোডকে পাঠাতে চান। তাই যোশেফ হেনরীর পরামর্শে রিলে পদ্ধতির মাধ্যমে বহুদূর খবর পাঠাতে সক্ষম হলেন। রিলে যন্ত্র হল ব্যাটারি লাগান কয়েল যাতে বিদ্যুৎ প্রবাহকে নিয়মিত দূরত্ব অন্তর জোরালো করা যায়। ১৮৩৫ সালে মোর্স তাঁর আবিষ্কৃত এই যন্ত্রের নাম দিলেন টেলিগ্রাফ। ১৮৩৭ সালে তিনি এই যন্ত্রের পেটেন্ট নিলেন। এর পাঁচ বছর পর আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র সরকারের অর্থ সাহায্যে ওয়াশিংটন থেকে বাল্টিমোর পর্যন্ত টেলিগ্রাফের লাইন বসালেন মোর্স। ১৮৪৪ সালের ২৪ মে প্রথম সংকেত বার্তাটি পাঠালেন মোর্স নিজেই। সংকেত বার্তাটি হল 'ঈশ্বরের অনুগ্রহে সম্ভব হল।' নিমেষের মধ্যে সে সংকেত বার্তা পৌঁছেছিল ওয়াশিংটন থেকে বাল্টিমোরে।

অ্যাসিটিলিন (১৮৩৬)

এডমণ্ড ডেভি

গ্রামের দিকে ফেরিওলারা অনেক সময় অ্যাসিটিলিন গ্যাসের আলো জ্বালায়। ক্যালসিয়াম কার্বাইড নামক একটি পদার্থের সঙ্গে জলের বিক্রিয়ায় যে গ্যাস তৈরী হয় সেটাই হল এই অ্যাসিটিলিন গ্যাস।

১৮৩৬ সালে ইংলণ্ডের এক বিজ্ঞানী এডমণ্ড ডেভি প্রথম এই গ্যাসের সন্ধান পান। বিজ্ঞানী এডমণ্ড রসায়নাগারে ক্যালসিয়াম ধাতু উৎপন্ন করা যায় কিনা এ নিয়ে গবেষণা চালাচ্ছিলেন। গবেষণার জন্য তিনি পোড়া চুন বা ক্যালসিয়াম অক্সাইড ও কার্বনের মিশ্রনকে বৈদ্যুতিক চুল্লিতে উত্তপ্ত করে দেখছিলেন ক্যালসিয়াম ধাতু পাওয়া যায় কিনা। এই পরীক্ষার পর তিনি পেলেন ধূসর রঙের এক কঠিন পদার্থ। ঐ পদার্থটি যে কি তা তিনি জানতেন না। পরীক্ষায় আশানুরূপ ফল না পেয়ে তিনি হতাশ হয়ে পড়লেন। বিরক্ত হয়ে তিনি পরীক্ষালব্ধ বস্তুটিকে ছুঁড়ে ফেলে দিলেন। ঘরের মধ্যে ছিল একটি

জলভরা পাত্র। পদার্থটি গিয়ে পড়ল তার মধ্যে। জলে পদার্থটি গিয়ে পড়তেই জল থেকে বুদবুদ উঠতে শুরু করল এবং ঘরটি অজানা এক গ্যাসের গন্ধে ভরে উঠল।

ডেভি কৌতূহলী হয়ে একটি নল যুক্ত কাচের পাত্রে গ্যাসটি সংগ্রহ করে নিয়ে পরীক্ষা করতে বসলেন। গ্যাসটি দাহ্য কিনা দেখার জন্য পাত্রের নলের মুখে আগুন জ্বালতেই গ্যাসটি উজ্জ্বল আলো সৃষ্টি করে জ্বলতে লাগল। তখন ডেভি ক্যালসিয়াম অক্সাইড ও কার্বনের মিশ্রণ উত্তপ্ত করে পাওয়া পদার্থটি গভীরভাবে গবেষণা করে। জানতে পারলেন ঐ পদার্থটি হল ক্যালসিয়াম কার্বাইড। নতুন আবিষ্কৃত গ্যাসটির নাম দেওয়া হল অ্যাসিটিলিন।

রাবারের আঠালোভাব দূরীকরণ (১৮৩৯)

চার্লস গুডইয়ার (১৮০০—১৮৬০)

রাবার থেকে গাড়ীর টায়ার, টিউব, জুতো, বেলুন, পাইপ, খেলনা এসব তৈরী হয়, এই রাবার হল হিভিয়া ব্র্যাসিলিয়েনসিস নামক এক উদ্ভিদের কাণ্ড থেকে নির্গত এক ধরণের সাদা আঠালো রস। এই রসকে বলে ল্যাটেক্স। এই ল্যাটেক্স ঘষে পেন্সিলের দাগ তোলা যেত বলে নাম দেওয়া হয় রাবার। কাঁচা রবারের জল প্রতিরোধক ক্ষমতা থাকায় মানুষ এই রাবারকে কাজে লাগাবার কথা ভাবতে থাকে। কিন্তু কাঁচা রাবার নরম, সহজে গরম গলে

যেত বলে কোনো কাজে লাগানো যেত না।

চার্লস গুডইয়ার নামে ফিলাডেলফিয়ার এক ব্যবসায়ী ছোট বয়স থেকেই ভাবতেন রাবারকে এমনভাবে তৈরী করতে হবে যাতে সেটি আবহাওয়া প্রতিরোধক হয়। তিনি নানান দ্রব্য কাঁচা রাবারের সাথে মিশিয়ে পরীক্ষা করে দেখতেন।

১৮৩৯ সালে একদিন তিনি রবারের আঠার সাথে সালফার বা গন্ধক মিশিয়ে পরীক্ষা করছিলেন। পরীক্ষা পাত্রটি ছিল আগুনের কাছে। কাজ করতে গিয়ে হাত লেগে কিছুটা রাবার পড়ে গেল আগুনের মধ্যে। কিন্তু তিনি অবাক হয়ে দেখলেন ঐ রাবারটি গরমে গলে গেল না। উনুন থেকে তুলে রাবারটি পরীক্ষা করে দেখলেন রাবারের আঠালো ভাবটি আর এই নতুন রাবারটিতে নেই।

রোমানদের আগুনের দেবতা ভালকানের নামানুসারে এই নতুন রাবারের নাম দেওয়া হল ভালকানাইজ রাবার এবং এই রাবার তৈরীর পদ্ধতির নাম দেওয়া হয় ভালকানাইজেশন। এই পদ্ধতিতে রাবারের ধর্মের বিশেষ পরিবর্তন হওয়ার ফলে রাবারকে স্বাভাবিক তাপে নাড়াচাড়া করা চলে এবং বেশিদিন টেঁকে। খুব ঠাণ্ডায় এই রাবার শক্ত হয় না বা খুব গরমে গলে যায় না।

১৯৪০ সালে গুডইয়ার এই আবিষ্কারের পেটেন্ট নেন। পরবর্তীকালে রসায়নাগারে কৃত্রিম উপায়ে রাবার তৈরী হতে থাকে।

ডাকটিকিট (১৮৪০)

স্যার রোনাল্ড হিল

যখন পৃথিবীতে পোস্টকার্ড বা টিকিট ব্যবহারের নিয়ম ছিল না তখন চিঠিপত্র পাঠাতে খুব খরচ হত। তখন নিয়ম ছিল যার কাছে চিঠি যাবে তাকেই মাশুল দিতে হবে। দূরত্ব হিসাব করে এই মাশুলের পরিমাণ ঠিক হত। সে সময় লণ্ডনে পার্লামেন্টের সভ্যরা বিনাপয়সায় চিঠি পাঠাতে

পারতেন। কেবল চিঠির ওপর তাঁর নাম বা সই থাকলেই চলত। তাঁরা অনেক সময় এই সুবিধার অপব্যবহার করতেন। এজন্য ডাকঘরের বেশী খরচ হওয়ার চিঠির মাশুল অত্যন্ত বেশী ছিল। গরীব লোকে এত বেশী মাশুল দিয়ে দরকারী চিঠি নিতে পারত না। অনেকে আবার কৌশল করে ডাকঘরকে ফাঁকিও দিত।

ইংলণ্ডের পোস্টমাস্টার জেনারেল স্যার রোনাল্ড হিল খুবই গরীব ঘরের ছেলে ছিলেন। তাকে ছোটবেলায় একদিন একটি দরকারী চিঠির মাশুল যোগাড় করবার জন্য রাস্তায় ঘুরে ঘুরে ছেঁড়া কাপড় বিক্রি করতে হয়েছিল। তাই তিনি গরীবের ডাকমাশুল যোগাড় করার কষ্ট ভাল করেই বুঝেছিলেন। তিনি চিঠি পাবার খরচ সম্বন্ধে অনেক হিসাব করে ইংলণ্ডের পার্লামেন্টে প্রস্তাব করেন যে চিঠি পাঠাবার খরচ খুবই কম। অনেক লোক চিঠি নিতে পারে না বা নেয় না। বড়লোকেরা বিনা পয়সায় অনেক চিঠি পাঠায় বলে বেশি খরচ ডাকঘরেরই হয়। তাই নিয়ম করা দরকার যে চিঠি পাঠাবার আগে মাশুল দিতে হবে। আবার মাশুল দেওয়া হয়েছে কিনা তা বুঝবার জন্য চিঠির ওপর একটা টিকিট লাগালেই হবে। কত মাশুল দেওয়া হয়েছে তাও লেখা থাকবে টিকিটে। এ প্রস্তাব আনার পর পার্লামেন্টে অনেক আপত্তি উঠল। শেষপর্যন্ত পার্লামেন্ট পদ্ধতিটা পরীক্ষা করতে রাজি হল।

তখন ১৮৪০ সালের ৬ই মে স্যার রোনাল্ড হিল ইংলণ্ডে এক পেনি ও দুপেনি মূল্যের দুটি রকমের টিকিট বের করলেন। প্রতি টিকিটের ওপর ইংলণ্ডের রাজার প্রতিকৃতি ছিল। টিকিট যাতে জাল না হয় তার জন্য টিকিটের মধ্যে জলছাপ দেওয়ার ব্যবস্থা ছিল। কয়েকবছর এই ব্যবস্থা পরীক্ষা করে দেখা গেল ব্যাপারটা খুবই সুবিধাজনক। তখন থেকেই সমস্ত পৃথিবী জুড়ে ডাকটিকিট ব্যবহৃত হতে লাগল। ১৮৫৩ সালে ডাকটিকিটকে সহজে কেটে নেবার জন্য টিকিটের চারধারে ফুটো করার কথা ভাবলেন আর্চার নামক এক যন্ত্রবিদ, এজন্য তিনি ফুটো করার একটি যন্ত্রও তৈরী করলেন। এরও অনেক পরে ডাকটিকিটের পেছনে আঠা শুকিয়ে লাগাবার ব্যবস্থা চালু হল।

ব্লটিং পেপার

ঊনবিংশ শতাব্দীতে ইংলণ্ডের বার্কশায়ারের ওয়েলিংফোর্ডের কিছুদূরে হ্যাগবোর্ন নামে এক জায়গায় একটি কাগজ তৈরীর কারখানা ছিল। কাগজ তৈরীর জন্য লাগে কাঠের মণ্ড, তার সাথে আরো কিছু জিনিস মিশিয়ে তবেই কাগজ তৈরী হয়। একদিন কারখানার মালিক ভুল করে কাঠের মণ্ডের সাথে প্রয়োজনীয় জিনিসগুলি না মিশিয়েই কাগজ কলে পাঠিয়ে দিলেন। ফলে যখন কাগজের নমুনা এল তাঁর কাছে, তখন তো তাঁর মাথায় হাত। কি অমসৃন কাগজ, লিখতে গেলে লেখা ধেবড়ে যাচ্ছে। এত কাগজ চোখের সামনে নষ্ট হয়ে যাবে! তাই মালিক ভাবতে লাগলেন কি কাজে লাগানো যায় এ কাগজকে। কাগজটাকে টেনে নিয়ে যতবার তিনি কালি দিয়ে লিখতে যাচ্ছিলেন ততবারই সেই কালি শুষে নিয়ে কাগজটা ভিজে উঠছিল আর লেখাটাও বিশ্রী হয়ে যাচ্ছিল। হঠাৎ তাঁর কলমের আগায় কিছুটা কালি এসে যেতে তিনি সেই কালিটা কাগজে ঠেকিয়েছেন অমনি কাগজটা ধীরে ধীরে শুষে নিতে লাগল সেই কালিকে, তখন সেই মালিক ভদ্রলোকটি ভাবলেন কাগজটাকে লেখার কাজে ব্যবহার না করে কালি শোষণের কাজেও তো ব্যবহার করা যায়। নিশ্চয়ই এতে সকলের সুবিধা হবে।

নতুন আবিষ্কৃত এই কাগজের গুণাগুণ প্রচার করে তিনি বাজারে ছাড়লেন। চাহিদাও বেড়ে গেল খুব, নতুন আবিষ্কৃত এই কাগজটির নাম দেওয়া হল ব্লটিং পেপার।

গান কটন (১৮৪৬)

ক্রিশ্চিয়ান ফ্রেডরিক স্কোয়েনবিন

১৮৩২ সালে নাইট্রিক অ্যাসিড ও চিনির বিক্রিয়ায় বিস্ফোরক পদার্থ আবিষ্কার হওয়ার পর থেকেই নাইট্রিক অ্যাসিড নিয়ে গবেষণা বেড়ে যায়। ১৮৪৬ সাল। সুইজারল্যাণ্ডের ব্যাসেল বিশ্ববিদ্যালয়ের রসায়নবিদ্যার অধ্যাপক

ক্রিশ্চিয়ান ফ্রেডরিক স্কোয়েনবিন তাঁর গবেষণাগারে গাঢ় নাইট্রিক অ্যাসিড ও গাঢ় সালফিউরিক অ্যাসিড মিশিয়ে উত্তপ্ত করে পরীক্ষা করে দেখেছিলেন নতুন কোনো কিছু আবিষ্কার করা যায় কিনা। পরীক্ষা করতে গিয়ে হঠাৎ কিছুটা গরম অ্যাসিড মাটিতে পড়ে যায়। তিনি তখনই কিছুটা সুতির কাপড় দিয়ে অ্যাসিডটি মুছে ফেলতে যান। গরম অ্যাসিডে কাপড় লাগতেই সঙ্গে সঙ্গে বিস্ফোরণ ঘটে যায়। তিনি এরপর কিছুটা তুলো আর কাগজে ঐ মিশ্রণে আলাদা আলাদা ভাবে মিশিয়ে দেখেন দুবারই আগের মত বিস্ফোরণ হল। তখন তিনি বুঝতে পারলেন সেলুলোজের সঙ্গে নাইট্রিক ও সালফিউরিক অ্যাসিডের বিক্রিয়া ঘটলেই একটি বিস্ফোরক পদার্থ তৈরী হয়। এই নতুন পদার্থটির নাম তিনি দেন গান কটন। নাইট্রিক অ্যাসিড ও সেলুলোজ এই পদার্থটির মধ্যে থাকায় পদার্থের আরেকটি নাম নাইট্রো সেলুলোজও দেওয়া হয়।

নাইট্রো-সেলুলোজের সাথে নাইট্রোগ্লিসারিন মিশিয়ে আলফ্রেড বারনার্ড নোবেল তৈরী করেছিলেন ব্লাস্টিং জিলাটিন ডিনামাইট।

নেপচুন (১৮৪৬)

লেভেরিয়ে ও গাল

ইউরেনাস আবিষ্কৃত হওয়ার পর বিজ্ঞানীরা সূর্য থেকে তার দূরত্ব এবং তার গতি নির্ণয়ের জন্য অঙ্ক কষতে শুরু করলেন, কিন্তু গাণিতিক পদ্ধতিতে নির্ণয় করা গতির সঙ্গে ইউরেনাসের গতির সামান্য অমিল হতে লাগল।

বিজ্ঞানীরা তখন অনেক গবেষণা করে সিদ্ধান্তে এলেন যদি অজ্ঞাত কোনো গ্রহের আকর্ষণ ইউরেনাসের ওপর পড়ে থাকে তবেই এই গতির অমিল ঘটতে পারে।

ব্রিটিশ বিজ্ঞানীরা অ্যাডাম্‌স ও ফরাসী বিজ্ঞানী লেভেরিয়ে অজ্ঞাত গ্রহটি ইউরেনাস থেকে কতদূরে এবং আকাশের ঠিক কোন অংশে তার অবস্থান সম্ভব তা গণনা করতে বসলেন।

ব্রিটিশ বিজ্ঞানী অ্যাডাম্‌সই প্রথম অজ্ঞাত গ্রহটি কোথায় থাকা সম্ভব তা গণনা করে ফেললেন। তিনি তাঁর গণনার ফলাফল জানিয়ে তাঁর পরিচিত জ্যোতির্বিজ্ঞানী চ্যালিসকে অজানা গ্রহটি অনুসন্ধান চালানোর অনুরোধ জানালেন। লণ্ডনের মানমন্দিরে তখন আকাশের গ্রহনক্ষত্রাদির ভাল নক্সা ছিল না। জ্যোর্তিবিজ্ঞানী চ্যালিস তাই কেম্‌ব্রিজ মানমন্দিরে গিয়ে আগে আকাশের নক্সা তৈরী করতে লাগলেন।

এদিকে লেভেরিয়ে গণনা শেষ করার পর বার্লিনের জ্যোতির্বিজ্ঞানী গালকে অজানা গ্রহ অনুসন্ধানের অনুরোধ জানালেন। বার্লিন মানমন্দিরে আগে থেকেই আকাশের নিখুঁত নক্সা তৈরী করা ছিল। তাই দূরবীণ দিয়ে ১৮৪৬ সালে একদিন লেভেরিয়ে যে স্থানে অজানা গ্রহটি থাকার সম্ভাবনার কথা বলেছিলেন সেখানে নক্ষত্রের চেয়ে খানিকটা বড় ম্লান আলোর চাকতির মত গ্রহটিকে দেখতে পেলেন গাল। নতুন গ্রহটি অন্ধকার মহাসমুদ্রের মত মহাকাশে ঘুরে বেড়াচ্ছে বলে রোমের সমুদ্র দেবতার নামানুসারে নাম দেওয়া হল 'নেপচুন'।

এ খবর শুনে বিজ্ঞানী অ্যাডাম্‌স ও চ্যালিস একটু কষ্ট পেয়েছিলেন কারণ অ্যাডাম্‌সই প্রথম গণনা শেষ করেছিলেন এবং চ্যালিসও আকাশের নক্সা তৈরীর জন্য দীর্ঘদিন অক্লান্ত পরিশ্রম করেছিলেন।

সূর্য থেকে নেপচুনের দূরত্ব ২৭৯.৩ কোটি মাইল তাই খালি চোখে এ গ্রহকে দেখা যায় না। নেপচুন সূর্যকে একবার আবর্তন করতে সময় নেয় ১৬৪ বছর ৬ মাস। নেপচুন পৃথিবীর চেয়ে চার গুণ বড়। নেপচুনের উপগ্রহ দুটি। একটির নাম টাইট্রন। অন্যটি নেরিড।

নাইট্রো গ্লিসারিন (১৮৪৭)

সোব্রেরা

বিস্ফোরক পদার্থ হিসেবে মানুষ একসময় কেবল বারুদকেই বুঝত। এই বারুদে আগুন দিলেই ঘটত বিস্ফোরণ। এরপর ১৮৩২ সালে রসায়ন বিজ্ঞানী হেনরী ব্রেকনন্ট তরল পদার্থ নাইট্রিক অ্যাসিডের সঙ্গে চিনি মিশিয়ে পরীক্ষা করতে গিয়ে পেলেন এক বিস্ফোরক পদার্থ। এই পদার্থে বিস্ফোরণ ঘটান জন্য আগুন দেবার দরকার হত না। নাইট্রিক অ্যাসিড থেকে বিস্ফোরক পদার্থ তৈরী হতে পারে এটা জানার পরে নাইট্রিক অ্যাসিড নিয়ে গবেষণাও বেড়ে গেল।

১৮৩৯ সালে ডুমাস ও পেলিউস নামক দুজন বিজ্ঞানী তুলা ও কাগজের সাথে নাইট্রিক অ্যাসিড মিশিয়ে একটি বিস্ফোরক পদার্থ তৈরী করলেন। কিন্তু বিজ্ঞানীরা এখানেই না থেমে আরো উন্নত বিস্ফোরক আবিষ্কার করার জন্য গবেষণা চালিয়ে যাচ্ছিলেন।

১৮৪৭ সালে একদিন ইটালীর দুই রসায়ন বিজ্ঞানী অ্যাস্কানি ও সোব্রেরা নাইট্রিক অ্যাসিড ও ধূমায়মান সালফিউরিক অ্যাসিডের মিশ্রণে ফোঁটা ফোঁটা গ্লিসারিন ফেলে পরীক্ষা চালাছিলেন। কিছুক্ষণ এভাবে গ্লিসারিন ফেলার পর তাঁরা দেখলেন মিশ্রণ থেকে হাল্কা হলুদ রঙের একটি তৈলাক্ত তরল পদার্থ পাত্রের তলায় আলাদাভাবে জমা হতে লাগল।

ঐ পদার্থের কি বৈশিষ্ট্য তা জানার জন্য সোব্রেরা একটুখানি মুখে দিয়ে দেখলেন পদার্থটিতে মুখ জ্বালা করে। পদার্থটি যে বিষাক্ত এটিও তিনি পরীক্ষা করে বুঝতে পারলেন। পদার্থটির কোন ভৌত বা রাসায়নিক পরিবর্তন ঘটে কি না জানার জন্য তিনি পদার্থটিকে ধীরে ধীরে উত্তপ্ত করতে লাগলেন। পদার্থটির উষ্ণতা ১০০ ডিগ্রী সেলসিয়াসের বেশী হতেই হলুদ রঙ পরিবর্তিত হয়ে পদার্থটি লাল রঙের হয়ে গেল। বর্ণ পরিবর্তন লক্ষ্য করার সময় হঠাৎ ঘটে গেল প্রচণ্ড বিস্ফোরণ। অবশ্য প্রাণে বেঁচে গেলেন সোব্রেরা। তিনি বুঝলেন পদার্থটি আঘাত পেলে বা উত্তপ্ত হলে বিস্ফোরণ ঘটায়। নতুন এই পদার্থটির নাম দেওয়া হল নাইট্রোগ্লিসারিন।

পরবর্তীকালে এই নাইট্রো গ্লিসারিনকেই নিরাপদভাবে ব্যবহার করার উপায় আবিষ্কার করেছিলেন আলফ্রেড বারনার্ড নোবেল।

ক্লোরোফর্ম (১৮৪৭)

জেমস ইয়ং সিমসন (১৮১১-)

আগেকার দিনে অস্ত্র চিকিৎসা ছিল এক ভয়াবহ ব্যাপার। আফিং বা মদ খাইয়ে রোগীর বোধ শক্তি অবশ করে রেখে অস্ত্র চিকিৎসা করা প্রচলিত ছিল। কিন্তু ওই নেশা একবার ধরে গেলে রোগীর জীবনের সর্বনাশ ঘটে যেত। ১৭৯৯ সালে হামফ্রে ডেভি নামক এক ইংরেজ বৈজ্ঞানিক নাইট্রাস অক্সাইড বা লাফিং গ্যাস আবিষ্কার করেন। এই লাফিং গ্যাস নিঃশ্বাসের সাথে নিলে ঘাড়ে মাথায় সুর্ সুর্ করে ওঠায় হাসি পেত। ডেভি লক্ষ্য করলেন এই গ্যাস একটু বেশী করে যদি মানুষ টানে তবে অল্প কিছুক্ষণের জন্য মানুষ অজ্ঞান হয়ে যায়। এই গ্যাস প্রয়োগ করে অস্ত্র চিকিৎসা করলে বেশী রক্তপাত হত বলে অস্ত্র চিকিৎসকরা এই গ্যাস ব্যবহার করতে চাইত না।

১৮৩১ সালে জার্মানীতে লিবিগ, প্যারীতে সুবেঁরা ও আমেরিকায় গুথরী ক্লোরফর্ম নামে এক জৈব তরল পদার্থ আবিষ্কার করেন। ক্লোরোফর্মের রাসায়নিক নাম ট্রাইক্লোরো মিথেন। পদার্থটির মিস্টি গন্ধ, স্ফুটনাঙ্ক ৬১ ডিগ্রী সেলসিয়াস। ইথাইল অ্যালকোহলকে ব্লিচিং পাউডার ও জল দিয়ে ফোটালে ক্লোরোফর্ম উৎপন্ন হয়। ক্লোরোফর্ম আবিষ্কৃত হলেও অস্ত্র চিকিৎসায় চেতনানাশক পদার্থ রূপে তার ব্যবহার শুরু হল না।

১৮৪৬ খ্রীঃ আমেরিকার ডাক্তার মর্টন সালফিউরাস ইথার এর সাহায্যে বিনা যন্ত্রণায় অস্ত্র চিকিৎসা করলেন। ১৮৪০ সালে আমেরিকার দুই দন্ত চিকিৎসক ডাঃ হোরাস ওয়েলস ও ডঃ বিগ্‌স লাফিং গ্যাসের সাহায্যে বিনা যন্ত্রণায় দাঁত তুলে ডেভির পরীক্ষার সত্যতা প্রমাণ করে দেখালেন।

ডঃ জেমস ইয়ং সিমসন সেসময় ছিলেন স্কটল্যাণ্ডের এডিনবরার ডাক্তার। অস্ত্রোপচারের সময় রোগীদের যন্ত্রণার হাত থেকে বাঁচাবার জন্য তিনি ডেভি ও মর্টনের আবিষ্কারই ব্যবহার করতে লাগলেন। এমন কি প্রসূতি মায়েদের কষ্ট কমানোর জন্যও তিনি এই চেতনানাশক পদার্থগুলি ব্যবহার শুরু করলেন।

এই ঘটনাতেই ধর্মযাজকরা রেগে গেলেন। তাঁরা বললেন ঈশ্বর মেয়েদের Woe-men অভিশাপ দিয়ে বলেছিলেন অসহ্য কষ্ট স্বীকার করে তাদের সন্তানের মুখ দেখতে হবে। সিমসন ঈশ্বরের এই আদেশের বিরুদ্ধাচরণ করেছেন চেতনা নাশক পদার্থ ব্যবহার করে। সিমসন ছিলেন ভীষণ বুদ্ধিমান, তিনি সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিলেন 'ঈশ্বর আদমের পাঁজরা থেকেই ঈভকে সৃষ্টি করেছেন, এই পাঁজরা নেওয়ার সময় ঈশ্বর আদমকে গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন করে দিয়েছিলেন একথাই লেখা আছে বাইবেলে। অর্থাৎ ঈশ্বরের পথই আমি অনুসরণ করেছি।'

এই জবাবে কারোর কিছু বলার রইল না।

সিমসন ইথারের চেয়েও ভাল চেতনা নাশক পদার্থের সন্ধান করতে লাগলেন। একদিন এক রাসায়নিকের কাছ থেকে ক্লোরোফর্ম নামক এক পদার্থ আনলেন। তিন সহকারী নিয়ে ১৮৪৭ সালের ৪ নভেম্বর তাঁরা ক্লোরোফর্মের গন্ধ শুঁকলেন, খানিকক্ষণ পর চোখ লাল হয়ে গেল। মনে স্ফূর্তি হল, তারপর হাসতে হাসতে, চেঁচাতে চেঁচাতে তিনজনেই টেবিলের নীচে পড়ে গেলেন। দীর্ঘসময় পর চেতনা ফিরল তাঁদের। দেহে কোনো অস্বস্তিও বোধ করলেন না তাঁরা।

আবিষ্কৃত হল ইথারের চেয়েও শক্তিশালী চেতনা নাশক দ্রব্য ক্লোরোফর্ম। ক্লোরোফর্ম আবিষ্কারের ১৬ বছর পর ক্লোরোফর্মকে চেতনানাশক হিসাবে চিকিৎসা বিজ্ঞানে কাজে লাগানোর জন্য সিমসনের নাম বিজ্ঞান জগতে স্মরণীয় হয়ে আছে।

সেলাই কল (১৮৫৪)

এলিয়াস হাউস (১৮১৯—১৮৬৭)

সেলাইকল বানানোর ইতিহাস শুরু হয়েছিল দীর্ঘকাল ধরে। প্রথম সেলাইকল তৈরী করেছিলেন ১৭৯০ সালে ইংলণ্ডের টমাস সেণ্ট। এই কলে অবশ্য কেবল চামড়া সেলাই হত। কাপড় সেলাই করার কল প্রথম বানালেন ফরাসী দরজী টিমোমনিয়ার। আশিটি কল তৈরী করে তিনি একটি কাপড় সেলাই-এর কারখানাও খুলেছিলেন কিন্তু সাধারণ দরজীরা কলের বাহাদুরীকে মেনে নিতে পারল না। নষ্ট করে দিল তারা কারখানাটাকে। ১৮৩৩ সালে আমেরিকার ওয়ালটার হাণ্টও উন্নত ধরনের সেলাইকল তৈরী করলেন। কিন্তু তিনি জনসাধারণকে জানালেন না তাঁর আবিষ্কারের কথা। ফলে অজানাই রয়ে গেল তাঁর সেলাই কল।

এর কয়েক বছর পরে সেলাইকলের ইতিহাসে সাহসের সাথে এগিয়ে এলেন এক দরিদ্র আমেরিকান কৃষক এলিয়াস হাউস। তিন সন্তানের পিতা এলিয়াসের সংসারে নিত্য অভাব। তাই তাঁর স্ত্রীকেও জামা সেলাই করে টাকা রোজগার করতে হত। গভীর রাত পর্যন্ত স্ত্রী সেলাই করেন। অথচ হাতে পান গুটি কয়েক টাকা। স্ত্রীর পরিশ্রম কমানোর ভাবনা থেকেই সেলাই কল বানাবার চিন্তাটা মাথায় আসে এলিয়াসের। সংসারই চলে না, সেলাইকল বানাবার পয়সা কোথায়। তাই এলিয়াস ছুটে গেলেন বন্ধু জর্জ ফিশারের কাছে।

১৮৪৪ সালের ডিসেম্বর মাস থেকে এলিয়াস সেলাইকল বানাবার চেষ্টা করে যেতে লাগলেন। প্রায় সবটা বানিয়ে ফেললেও একটা বিষয়ে মুস্কিলে

পড়ে গেলেন তিনি। যে সূঁচ দিয়ে সেলাই করা হয় তার পেছনের ফুটোয় সুতো পরিয়ে আমরা সেলাই করি। কিন্তু সূঁচের সুতোটা যদি পিছনে থাকে তবে সেলাইকলে সেলাই হবে কি করে? কয়েক বছর ধরে তিনি কোনো উপায় বের করতে পারলেন না। একদিন তিনি দেখলেন একটা অদ্ভুত স্বপ্ন।

এক অসভ্যদেশের রাজা এলিয়াসকে বন্দী করে নিয়ে এসে হুকুম করলেন সেলাইকল বানিয়ে দিতে হবে। নাহলে মৃত্যুদণ্ড। কিন্তু এলিয়াস তো একটুর জন্য সেলাইকলটা পুরোপুরি বানাতে পারছেন না। তাই রাজার আদেশে সেপাই বল্লম নিয়ে মারতে এল তাঁকে। বল্লমটা যখন প্রায় ঠেকে এসেছে তাঁর বুকের কাছে এমন সময় দেখলেন বল্লমের ফলকের মুখে একটা ছোট্ট ফুটো। ভয়ে ঘুম ভেঙে গেল তাঁর, তখনি মনে হল যদি সূঁচেরও মুখের কাছে ফুটো করে সুতো পরানো যায় তাহলে কেমন হয়?

১৮৫৪ সালে এপ্রিল মাসে সেলাইকল পুরোপুরি বানিয়ে নিজের আর বন্ধু ফিশারের জন্য দুটো স্যুট বানিয়ে ফেললেন। এবার তিনি নামলেন প্রচারের কাজে। নানান ঝড়-ঝাপ্টার পর আলো দেখলেন। প্রচুর অর্থও রোজগার করতে লাগলেন সেলাইকল থেকে। সেলাইকলের আবিষ্কারক হিসাবে ছড়িয়ে পড়ল তাঁর নাম।

আলকাতরা

উইলিয়াম হেনরী পার্কিন স (১৮৩৮)

খনি থেকে উত্তোলিত কয়লাকে জ্বালানীর কাজে লাগাতে গেলে কয়লাকে পুড়িয়ে নিতে হয়। পোড়ানোর সময় উৎপন্ন হয় প্রচুর গ্যাস। ১৬৬০ সালে জন ক্লেট্যান ও রবার্ট বয়েল ঐ গ্যাসের পরিচয় জানার জন্য গ্যাসটিকে

নলের ভিতর দিয়ে প্রবেশ করিয়ে ঠাণ্ডা করলেন। তাঁরা দেখলেন নলের গায়ে জমেছে কুচকুচে কালো দুর্গন্ধযুক্ত একটি তরল পদার্থ। কিন্তু পদার্থটি যে কি তার সন্ধান তাঁরা পেলেন না।

এরপর দীর্ঘ কয়েক শতাব্দী কেটে গেছে। লণ্ডনের রয়্যাল কলেজ অফ সায়েন্সের কৃতী ছাত্র উইলিয়াম হেনরী পার্কিনস ঐ নতুন পদার্থটির প্রকৃত পরিচয় দিলেন। তরল পদার্থটির নাম দিলেন আলকাতরা।

আলকাতরা উৎপন্ন করতে গেলে অগ্নিসহ মাটি দিয়ে তৈরী কতকগুলো আবদ্ধ বকযন্ত্রে বায়ুহীন পরিবেশে বিটুমিনাস কয়লাগুঁড়োকে প্রডিউসার গ্যাসের সাহায্যে ১০০০° সেলসিয়াস তাপমাত্রায় উত্তপ্ত করা হয়। উত্তপ্ত কয়লার উদ্বায়ী ও অনুদ্বায়ী দুটি অংশ আলাদা করে নিয়ে উদ্বায়ী গ্যাসীয় পদার্থগুলি বাঁকানো লোহার নলের ভেতর দিয়ে প্রবেশ করিয়ে তারপর একটি ঠাণ্ডা জলের পাত্রে লোহার নলটিকে রাখা হয়। ঠাণ্ডার সংস্পর্শে এসে গ্যাস থেকে আলকাতরা বিচ্ছিন্ন হয়ে একটি আলাদা পাত্রে জমা হতে থাকে।

পার্কিনসের গবেষণার পর বিজ্ঞানীরা আলকাতরা নিয়ে গবেষণা চালাতে থাকেন, গবেষণার ফলে জানা যায় আলকাতরায় যেসব পদার্থ মিশ্রিত আছে তাদের স্ফুটনাঙ্ক বিভিন্ন। ১৭০° সেন্টিগ্রেড উষ্ণতায় আলকাতরা পাতিত করে পাওয়া যায় লঘু তেল। এই লঘু তেলের মধ্যে থেকে পাওয়া যায় বেঞ্জিন, টলুইন ও জাইলিন। ১৭০° সেন্টিগ্রেড থেকে ২৩০° সেন্টিগ্রেড উষ্ণতায় পাতিত করে পাওয়া যায় মধ্যম তেল। যার থেকে পাওয়া যায় কার্বলিক অ্যাসিড ও ন্যাপথালিন। ২৩০° সেন্টিগ্রেড থেকে ২৭০° সেন্টিগ্রেড উষ্ণতায় পাতিত করে পাওয়া যায় ভারী তেল বা ক্রিয়াজোট তেল। যার থেকে পাওয়া যায় কেসল্স। ২৭০° সেন্টিগ্রেড থেকে ৩৬০° সেন্টিগ্রেড উষ্ণতায় পাতিত করে পাওয়া যায় সবুজ তেল বা অ্যানথ্রাসিন তেল। এর থেকে পাওয়া যায় অ্যানথ্রাসিন ও ফেনানথ্রিন। অবশেষে বাকি যা পড়ে থাকে তা হল পিচ।

আলকাতরায় কার্বন পরমাণুগুলো বিচ্ছিন্ন অবস্থায় মিশে থাকে বলে আলকাতরার রঙ কুচকুচে কালো।

বেঞ্জিন, টলুইন প্রভৃতি বস্তুতে মোটরগাড়ীর জ্বালানী রূপে, ড্রাইওয়াসে, ওষুধ এবং বিস্ফোরক তৈরীতে ব্যবহার করা যায়। টলুইন থেকে আবার

স্যাকারিন পাওয়া যায়। কার্বলিক অ্যাসিড ও ন্যাপথালিন ব্যবহৃত হয় ওষুধ ও বিস্ফোরক তৈরীতে এবং প্লাস্টিক শিল্পে। রঞ্জক হিসাবে, কাঠ সংরক্ষণের কাজে, পিচ্ছিল কারক তেল তৈরীতে ক্রিয়োজোট তেল ও অ্যানথ্রাসিন বা সবুজ তেল ব্যবহৃত হয়। পিচ ব্যবহৃত হয় রাস্তা তৈরীর কাজে, পোকা-মাকড়ের হাত থেকে কাঠকে সুরক্ষা দেবার জন্য এবং লোহায় মরিচা রোধ করার কাজে।

কৃত্রিম নীল রং (১৮৫৬)

উইলিয়াম হেনরী পার্কিন স (১৮৩৮)

লণ্ডনের রয়্যাল কলেজ অফ সায়েন্সের ছাত্র ছিলেন উইলিয়াম হেনরী পার্কিনস। তিনি ছিলেন রসায়ন বিজ্ঞানের ছাত্র। ১৮৫৩ সাল থেকেই দিনরাত গবেষণার কাজেই ব্যস্ত থাকতেন পার্কিনস।

সে সময় ম্যালেরিয়ার ওষুধ কুইনাইন তৈরী হত সিঙ্কোনা গাছের ছাল থেকে। কিন্তু এই সিঙ্কোনা গাছ তো সর্বত্র হয় না তাই কুইনাইনের চাহিদা কিছুতেই মেটানো যেত না। এজন্য পার্কিন কৃত্রিমভাবে কুইনাইন প্রস্তুতের উপায় খুঁজে বের করার জন্য গবেষণায় বসলেন।

পার্কিনস ১৮৫৬ সালে আলকাতরা জাত যৌগ থেকে কুইনাইন প্রস্তুত করা যায় কিনা পরীক্ষা করতে লাগলেন। আলকাতরা থেকে লাল্‌চে বাদামী রঙের কাদার মত একটি পদার্থ পেলেন যার সাথে খানিকটা মিল আছে কুইনাইনের। কিন্তু সেটা কুইনাইন নয়। নিরুৎসাহ না হয়ে তিনি আবার পরীক্ষায় বসলেন। এবার আলকাতরার মতই কালো রঙের একটি পদার্থ পরীক্ষার পর পাওয়া গেল। দু বার চেষ্টার পরও উপযুক্ত জিনিসটি না পাওয়া যেতে ঐ পদার্থে ভরা শিশিটি ছুঁড়ে ফেলে দিতে যাচ্ছিলেন পার্কিনস। হঠাৎ তিনি দেখতে পেলেন ঐ কালো পদার্থের মধ্যে রয়েছে চমৎকার নীল রং। তিনি আর পদার্থটি ছুঁড়ে ফেললেন না। তার মধ্যে অ্যালকোহল মিশিয়ে

আরো সুন্দর নীল রঙ প্রস্তুত করলেন। রঙটির নাম দিলেন 'অ্যানিলিন মভ'। কুইনাইন ওষুধ আবিষ্কার করতে গিয়ে ১৮৫৬ সালে তিনি আবিষ্কার করে ফেললেন কৃত্রিম নীল রং তৈরীর পদ্ধতি।

ডিনামাইট (১৮৬২)

আলফ্রেড বার্ণাড নোবেল (১৮৩৩—১৮৯৬)

সুইডিস দেশের লোক আলফ্রেড বার্ণাড নোবেলের বাবার ছিল টর্পোডো ও মাইন তৈরীর কারখানা। কিশোর আলফ্রেডের এ সব অস্ত্রশস্ত্র তৈরী করতে এতটুকু ভাল লাগত না। তাঁর আগ্রহ ছিল রসায়ন ও কারিগরী বিদ্যায়।

ইতালি দেশের রসায়নবিদ সোব্রেরা ১৮৪৭ সালে নাইট্রোগ্লিসারিন নামে একটি রাসায়নিক পদার্থ আবিষ্কার করেছিলেন। এই নাইট্রোগ্লিসারিন তৈরী হত গ্লিসারিন-এর সঙ্গে নাইট্রিক অ্যাসিড ও ধূমায়মান সালফিউরিক অ্যাসিড মিশিয়ে। এটি ছিল তরল পদার্থ, একটু গরম হলে বা নাড়াচাড়া করলেই বিস্ফোরণ ঘটে যেত। এই নাইট্রোগ্লিসারিণকেই উৎপাদন করে বিক্রি করতেন আলফ্রেড বার্ণাড।

নাইট্রোগ্লিসারিনের মত বিস্ফোরক পদার্থকে এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় পাঠানো খুব অসুবিধা হত। তাই আলফ্রেড নোবেল এই নাইট্রো গ্লিসারিনকে যাতে নিরাপদে ব্যবহার করা যায় তার জন্য গবেষণা শুরু করলেন। হঠাৎই ১৮৬২ সালে একদিন গবেষণা করতে গিয়ে পেয়ে গেলেন নাইট্রো গ্লিসারিনকে নিরাপদে ব্যবহার করার উপায়।

নাইট্রোগ্লিসারিনকে কোনো শোষক পদার্থ দিয়ে শোষণ করলে সেটির

বিস্ফোরক ক্ষমতা পুরোপুরি বজায় থাকে অথচ তাকে নিরাপদে ব্যবহার করা যায়। এই শোষক পদার্থের সন্ধান চালাতে গিয়েই তিনি পেলেন কিসেলগার নামক এক প্রকার বেলেমাটি। কিসেলগার শোষিত নাইট্রোগ্লিসারিনের নাম দেওয়া হল গার ডিনামাইট। কিসেলগারের চেয়েও উন্নত শোষক খুঁজতে গিয়ে ১৮৬৭ সালে আলফ্রেড নোবেল পেলেন সোরা। সোরা যেমন উন্নত শোষক তেমনি তাতে প্রচুর পরিমাণে অক্সিজেন থাকায় নাইট্রোগ্লিসারিনের বিস্ফোরক ক্ষমতাও বেড়ে যায়। তাই সোরা শোষিত নাইট্রোগ্লিসারিন আরো উন্নত ডিনামাইটে পরিণত হল। এরপর একে একে আবিষ্কৃত হয় অ্যামোনিয়াম ডিনামাইট, ব্যালিস্টাইন ডিনামাইট। এরপর নাইট্রোসেলুলোজের সঙ্গে নাইট্রোগ্লিসারিন মিশিয়ে ব্লাস্টিং জিলাটিন তৈরী করলেন।

সারাজীবনে প্রচুর অর্থ উপার্জন করেছিলেন নোবেল এই ডিনামাইট তৈরী করে। একসময় তিনি দেখলেন তাঁর আবিষ্কৃত ডিনামাইটকে মানুষ কল্যাণের কাজে লাগাবার কথা না ভেবে মারাত্মক অস্ত্র হিসাবে ব্যবহার করার কথা ভাবছে। তখন তিনি ভেবেছিলেন তাঁর সঞ্চিত অর্থ মানুষের কল্যাণে নিয়োজিত মানুষদের স্বীকৃতির কাজে লাগাবেন। তাঁর সেই অর্থ থেকেই প্রতিবছর সুইডিশ একাডেমী বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার, সেরা সাহিত্য কর্ম ও শান্তির উদ্দেশ্যে কাজের জন্য পুরস্কার দেয়।

পার্কেসিন (১৮৬২)

আলেকজাণ্ডার পার্কস

সেলুলোজ হল উদ্ভিদের দেহ কোষের একটি উপাদান। তুলো, পাট, বাঁশ, কাঠ প্রভৃতির আঁশ থেকে এই সেলুলোজকে পাওয়া যায়। এই সেলুলোজ নিয়ে বিজ্ঞানীরা নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করছিলেন।

বার্মিংহামের অধিবাসী রসায়ন বিজ্ঞানী আলেকজাণ্ডার পার্কস-এর গবেষণার বিষয় ছিল এই সেলুলোজ। ১৮৬২ সাল। একদিন তিনি সেলুলোজের সাথে নাইট্রিক অ্যাসিড মিশিয়ে ফেললেন। বিক্রিয়ায় উৎপন্ন পদার্থটিকে পরীক্ষা করতে গিয়ে তিনি দেখলেন পদার্থটি দাহ্য এবং বিস্ফোরকও। নতুন উৎপন্ন এই পদার্থটির নাম দিলেন নাইট্রোসেলুলোজ।

এই নাইট্রো সেলুলোজ তৈরী করতে গিয়ে একদিন তিনি দেখলেন সেলুলোজের সাথে নাইট্রিক অ্যাসিড বেশী পরিমাণে মেশালে তবেই পাওয়া যায় নাইট্রো সেলুলোজ। কিন্তু নাইট্রিক অ্যাসিড যদি অল্প পরিমাণে মেশানো যায় তবে পাওয়া যায় অন্য একটি পদার্থ, যেটি বিস্ফোরকও নয়, দাহ্যও নয়। এই নতুন পদার্থটি শক্ত অথচ দাহ্য না হওয়ায় তিনি পদার্থটিকে ব্যবসায়িক কাজে লাগাবার কথা ভাবলেন। পদার্থটি দিয়ে তৈরী করলেন বোতাম, কলম দানি, কলম, মেডেল প্রভৃতি। তাঁর নামানুসারে পদার্থটির নাম দেওয়া হল পার্কেসিন। একটি প্রদর্শনীও করেন তিনি, ফলে পার্কেসিন বেশ জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। প্লাস্টিক তৈরীর আগে এই পার্কেসিনই মানুষের চাহিদা মেটাতো।

কার্বলিক অ্যাসিড (১৮৬৮)

যোশেফ লিস্টার

উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে বেশীরভাগ রোগীই অস্ত্রোপচারের পর ক্ষত বিষিয়ে যাওয়ায় মারা যেত। আবার চিকিৎসকের হাত ও পোশাক সঠিকভাবে জীবাণুমুক্ত না হওয়ায় সেই ক্ষতের জীবাণু চিকিৎসকের মাধ্যমে অন্য রোগীর দেহেও ছড়িয়ে পড়ত। পাস্তুরই প্রথম বলেছিলেন বাতাসে বিভিন্ন জীবাণু ঘুরে বেড়ায়। এই জীবাণুই ক্ষতে পচন ধরায় এবং বংশবিস্তার করে সেখান থেকে চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ে।

যোশেফ লিস্টার ছিলেন গ্লাসগো হসপিটালের অস্ত্রচিকিৎসক। তিনি পাস্তুরের কথাকেই প্রমাণ করে দেখালেন যে ক্ষতস্থান জীবাণু থেকেই বিষাক্ত হয়, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকলে এই জীবাণু সংক্রমণ ঘটে না। অনেক পরীক্ষার পর তিনি দেখলেন কার্বলিক অ্যাসিডই সবচেয়ে ভালোভাবে জীবাণুকে নষ্ট করতে পারে। এটি ক্ষতে যেমন সরাসরি দেওয়া যায়, তেমনি স্প্রে করে বাতাসেও ছড়িয়ে দেওয়া যায়। এই অ্যাসিডে মানবদেহে কোনো ক্ষতিও হয় না। তিনি গরমজলে কার্বলিক অ্যাসিড সহযোগে অস্ত্রোপচারের যন্ত্রপাতি জীবাণুমুক্ত করার কথাও বলেন। ডাক্তার ও নার্সদের নাকে ওষুধ দেওয়া পাতলা কাপড় বেঁধে নেওয়ার ব্যবস্থাও করেন। ফলে হাসপাতালে ক্ষত বিষাক্ত হয়ে রোগী মারা যাওয়ার সংখ্যাও অনেক কমে যায়। ১৮৬৮ সালে যোশেফ লিস্টার আবিষ্কৃত কার্বলিক অ্যাসিড প্রথম ব্যবহৃত হয়।

সেলুলয়েড (১৮৬৯)

জন উইসলি হায়াট ও ইসাইয়া হায়াট

হাতির দাঁত দিয়ে নানা শৌখিন দ্রব্য এবং বিলিয়ার্ড খেলার বল তৈরী করত নিউইয়র্কের একটি বড় শিল্প প্রতিষ্ঠান। এই হাতির দাঁত আমদানী করা হত। ১৮৬৫ সালে হঠাৎ আমদানী কমে যাওয়ায় তারা সমস্যার পড়ে গেল। সেই প্রতিষ্ঠানটি তখন দেশের বিজ্ঞানীদের জানাল তাঁরা কেউ যদি হাতির দাঁতের বিকল্প কোনো বস্তু আবিষ্কার করতে পারেন তবে তাঁকে পুরস্কৃত করা হবে। বহু বিজ্ঞানী এগিয়ে এলেন এই কাজে। এগিয়ে এলেন জন উইসলি হায়াট ও ইসাইয়া হায়াট নামে দুই ভাই।

হায়াট ভায়েরা জানতেন কলোডিয়ন নামে এক ধরণের রাসায়নিক পদার্থকে দেহের কাটা জায়গায় লাগালে রক্ত তাড়াতাড়ি জমাট বাঁধে। এই কলোডিয়ন পাওয়া যায় নাইট্রোসেলুলোজ নামক একটি পদার্থ থেকে। (সেলুলোজের সাথে নাইট্রিক অ্যাসিড মিশিয়ে এটি পাওয়া যায়।) তাই হায়াট ভাইয়েরা এই নাইট্রোসেলুলোজের সাথে বিভিন্ন পদার্থ মিশিয়ে দেখতে লাগলেন যদি তাঁদের আকাঙ্খিত বস্তুটি পাওয়া যায়।

একদিন তাঁরা নাইট্রোসেলুলোজ-এর সঙ্গে মেশালেন কর্পূরকে। কিছুক্ষণ পরেই তাঁরা দেখলেন নাইট্রোসেলুলোজ রূপান্তরিত হল হাতির দাঁতের মত সাদা স্বচ্ছ একটি পদার্থে। পদার্থটিকে স্বচ্ছ, সাদা বা রঙিন নানারকমভাবে, নানা ছাঁচে তৈরী করা যায়। ১৮৬৯ সালে আবিষ্কৃত এই পদার্থের নাম দেওয়া হল সেলুলয়েড। নাইট্রোসেলুলোজ যেহেতু দাহ্য পদার্থ তাই সেলুলয়েডের মধ্যেও দাহ্য ক্ষমতা বর্তমান।

টেলিফোন (১৮৭৬)

আলেকজাণ্ডার গ্রাহাম বেল (১৮৪৭—১৯২২)

১৮৩৫ সালে টেলিগ্রাফ আবিষ্কার হতে এক স্থান থেকে অন্যস্থানে সংকেত বার্তা পাঠানো সম্ভব হল। কিন্তু বিজ্ঞান এখানেই থেমে রইল না। তরুণ গ্রাহাম বেল বললেন, 'আমি যন্ত্রকেও কথা বলাব।'

উত্তরাধিকার সূত্রেই গ্রাহাম বেল ছোটবেলা থেকেই মূক ও বধিরদের কথা বলানোর পদ্ধতি নিয়ে চর্চা করতেন। বিজ্ঞানের প্রতি যথেষ্ট আগ্রহ থাকায় টেলিগ্রাফের কথা জানা ছিল তাঁর। কয়েকজন বিজ্ঞানী [illegible] টেলিগ্রাফের তারের ওপর দিয়ে সংগীত-ধ্বনি পাঠাবার চেষ্টা করছিলেন তখন গ্রাহাম বেলও টেলিগ্রাফের তারের মাধ্যমে শব্দকে পাঠানো যায় কিনা তা গবেষণা করতে শুরু করলেন। গ্রাহাম বেলকে সাহায্যের জন্য এগিয়ে এলেন বন্ধু টমাস ওয়াটসন। সাহায্য করতে লাগলেন অর্থ দিয়েও।

গ্রাহাম বেল জানতেন যে কোনো শব্দ হাওয়াতে শব্দতরঙ্গ সৃষ্টি করে। সেই শব্দ তরঙ্গ যখন কানের পর্দা ও তার পেছনের ছোট একটি হাড়কে কাঁপিয়ে তোলে, তখনই আমরা সে শব্দকে শুনতে পাই। এই ধারণা থেকেই তিনি গ্রাহক ও প্রেরক যন্ত্র তৈরীর কথা ভাবলেন।

প্রথমে একটি শিঙার মত দেখতে প্রেরক যন্ত্র তৈরী করে তার সাথে একটি নল লাগালেন, নলের মধ্যে রাখলেন একটি লোহার পাত। লোহার পাতের সাথে একটি তামার তার জুড়ে দিলেন। তামার তারের অপর প্রান্তেও ঠিক অনুরূপ একটি লোহার পাতলা পাত লাগালেন। লোহার পাতের সঙ্গে

লাগিয়ে দিলেন গ্রাহক যন্ত্র। গ্রাহক ও প্রেরক যন্ত্রের এই ব্যবস্থাটিকে রাখলেন একটা তড়িৎ-চুম্বকের সামনে। এবার তিনি প্রেরক যন্ত্রের সামনে কথা বললেন। সঙ্গে সঙ্গে তামার তার লাগানো লোহার পাতলা পাতটিতে কম্পনের সৃষ্টি হল। কাছেই ছিল তড়িৎ চুম্বক। ফলে তারের মধ্যে আন্দোলিত তড়িৎপ্রবাহের সৃষ্টি হল তড়িৎ-চুম্বকীয় আবেশ নিয়মটির মাধ্যমে। স্পন্দনযুক্ত এই তড়িৎ প্রবাহ গ্রাহকযন্ত্রে পৌঁছালে সেটি যখন পাতলা লোহার পাতে লাগল তখন তড়িৎ তরঙ্গ রূপান্তরিত হল শব্দ তরঙ্গে। ১৮৭৬ সালের ১০ মার্চ নতুন আবিষ্কৃত এই যন্ত্রটির মাধ্যমে দুই বন্ধু একটি বাড়ীর নীচের তলা থেকে ওপর তলায় কথা বললেন। ১৩ মার্চ যন্ত্রটির নাম দেওয়া হল টেলিফোন।

প্রথমদিকে অবশ্য জনসাধারণ এই টেলিফোন যন্ত্রটিকে কেবল খেলনা বলেই মনে করেছিল। ১৮৭৯ সালে লণ্ডন শহরে প্রথম টেলিফোন এক্সচেঞ্জ চালু হয়। ১৮৮৪ সালে বোস্টন থেকে নিউইয়র্কে প্রথম সুদূরপ্রসারী টেলিফোন ব্যবস্থা চালু হয়।

ফনোগ্রাফ (১৮৭৭)

টমাস আলভা এডিসন (১৮৪৭—১৯৩১)

বাবা ছিলেন ব্যবসায়ী, মা স্কুলের প্রাক্তন শিক্ষিকা, তাঁদের বারো বছরের ছেলে স্কুল থেকে বিতাড়িত হয়ে স্বনির্ভর হওয়ার আশায় শুরু করল গ্র্যাণ্ড ট্র্যাঙ্ক রেল রোডে খবর কাগজ ফেরিওয়ালার কাজ। পনেরো বছর বয়সে একটি মুদ্রণ যন্ত্র কিনে রেল গাড়ীর পড়ে থাকা কামরার মধ্যে নিজেই

'হেরাল্ড' নামে কাগজ প্রকাশ করতে লাগল। পাশাপাশি চলতে লাগল রাসায়নিক গবেষণার কাজ। এক ভদ্রলোকের সাহায্যে টেলিগ্রাফ পদ্ধতি শিখে নিয়ে একুশ বছর বয়সে বোস্টনের ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন টেলিগ্রাফ কোম্পানীতে কাজও পেয়ে গেল ছেলেটি। পরবর্তীকালে এই দস্যি ছেলেই হল ফনোগ্রাফের আবিষ্কারক টমাস আলভা এডিসন।

টেলিগ্রাফ কোম্পানীতে এডিসনের কাজ ছিল দিনেরবেলা যে খবর আসে সেগুলো সংগ্রহ করা। কিন্তু দিনেরবেলার থেকেও রাতেই বেশী খবর আসে। তাই রাতের কাজে টাকা পাওয়া যায় বেশী। এডিসন সেজন্য দিনের কাজের সাথে রাতের কাজও যোগাড় করে ফেললেন ঐ কোম্পানীতেই। রাতে যিনি ঐ কোম্পানীতে খবর পাঠাতেন তিনি হঠাৎ বদলী হয়ে যেতে এলেন অন্য এক লোক। তিনি খুব দ্রুত খবর পাঠাতেন, সেই খবর সংগ্রহ করতে এডিসনের একটু অসুবিধা হত। তক্ষণি এক কৌশল বের করলেন তিনি। যোগাড় করে নিলেন স্যামুয়েল মোর্সের বানানো দুটো বাড়তি টেলিগ্রাফ যন্ত্র। কারণ খবর আসত মোর্স কোড টরে টক্কার মাধ্যমে। মোর্স টেলিগ্রাফের একটিতে খুব পাতলা কাগজের ফালি কেটে ঢুকিয়ে দিয়ে কাগজের ফালির অপর প্রান্তটি জুড়ে দিলেন কোম্পানীর টেলিগ্রাফ যন্ত্রটির সাথে। ফলে যেই দ্রুত খবর আসতে লাগল সঙ্গে সঙ্গে আপনা থেকে কাগজের ওপর বিভিন্ন সংকেতের দাগ পড়তে লাগল। খবর নেওয়া শেষ হতে অপর মোর্স টেলিগ্রাফ যন্ত্রতে কাগজটি ঢুকিয়ে ধীরে ধীরে টানতে শুরু করতেই টরে টক্কা শব্দ পুনরাবৃত্তি হতে লাগল। ফলে দ্রুত সংবাদ সংগ্রহ করতে কোনো অসুবিধা রইল না।

বেশ কিছুদিন চলছিল এভাবেই, এদিকে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে প্রেসিডেন্ট নির্বাচন হচ্ছে। নানা দিক থেকে আসছে নানা খবর। এমন সময় একটা মোর্সের টেলিগ্রাফ যন্ত্র খারাপ হয়ে গেল। তাই রাতদিন পরিশ্রম করেও সব খবর দিতে পারলেন না এডিসন। কোম্পানীর মালিক ক্ষুব্ধ হয়ে চাকরী থেকে বরখাস্ত করলেন এডিসনকে।

পেটের দায়ে পথে পথে চাকরীর আশায় হন্যে হয়ে ঘুরে বেড়ালেন। শেষমেষ কাজের দক্ষতার জন্য নিউইয়র্কের এক টেলিগ্রাফ অফিসের অফিস পরিদর্শকের কাজ হাতে এসে গেল। এইসময় এডিসনের মনে হয়েছিল যদি

টেলিগ্রাফের 'টরেটক্কা' শব্দ থেকে কাগজে দাগ কাটা যায় এবং সেই দাগ থেকে আবার 'টরেটক্কা' শব্দ বের করা যায়, তবে কণ্ঠস্বর থেকে দাগ কেটে সেই দাগ থেকেও নিশ্চয় অন্যরূপ কণ্ঠস্বর পাওয়া যাবে। এই ভাবনা থেকেই ১৮৭৭ সালের ১৮ জুলাই একটা পাতলা চামড়াকে একটা গোলাকার চোঙের সঙ্গে টান টান করে বাঁধলেন। চোঙের সাথে একটা হাতল লাগালেন। এবার পাতলা চামড়ার সঙ্গে একটা লোহার পিনকে শক্ত করে আটকালেন। পিনের তলায় একটা মোম মাখানো কাগজ এমনভাবে রাখলেন যাতে পিনটা কাগজে গিয়ে ঠেকে। এবার চোঙের হাতলটা ঘুরিয়ে চোঙের সামনে মুখ রেখে বললেন —

Mary had a little lamb.
Its fleece was white as snow.

সঙ্গে সঙ্গে কাগজের ওপর দাগ পড়ে গেল। এবার ওই দাগের ওপর পিন বসিয়ে হাত ঘোরাতেই অস্পষ্টভাবে বেরিয়ে এল সেই শব্দ। আবিষ্কৃত হল ফনোগ্রাফ। মোমের কাগজের থেকেও রাংতা ও টিনের পাতে আরো স্পষ্ট শব্দ পাওয়া গেল। এই ফনোগ্রাফেরই বর্তমান নাম গ্রামোফোন।

বৈদ্যুতিক বাতি (১৮৭৯)

টমাস আলভা এডিসন (১৮৪৭—১৯৩১)

১৭৫২ সালে আমেরিকার বিজ্ঞানী বেনজামিন ফ্রাঙ্কলিন গবেষণা করে দেখেন যে বিদ্যুতের স্ফুলিঙ্গ ও আকাশের বিদ্যুতের চমক সমধর্মী। উনবিংশ শতাব্দীতে বিজ্ঞানীরা ভাবতে থাকেন আকাশের বিদ্যুৎ স্ফুরণের সাথে সাথে যদি আলো উৎপন্ন হতে দেখা যায় তবে বিদ্যুৎ প্রবাহের মাধ্যমেও নিশ্চয়ই আলো উৎপন্ন করা সম্ভব হবে।

বিখ্যাত বিজ্ঞানী টমাস আলভা এডিসন ইলেকট্রিক বাল্ব নিয়ে তাঁর

গবেষণার প্রথমদিকে ধাতুর তারকে বিদ্যুৎ প্রবাহে গরম করে আলো উৎপন্ন করার কথা ভেবেছিলেন। তিনি লক্ষ্য করেন ধাতুর তারে যত কুণ্ডলী বেশী হয় এবং তারটি যত সরু হয় তত বেশী তারটি উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। কিন্তু এই সরু ধাতুর তার বা ফিলামেণ্ট তৈরী করা সহজ নয়। আবার সব ধাতুর তাপ সহ্য করার ক্ষমতা নেই। যে প্লাটিনামের তাপ সহ্য করার ক্ষমতা সবচেয়ে বেশী সেই প্লাটিনামের সরু ফিলামেন্টও বিদ্যুৎ প্রবাহে গলে যেতে লাগল। অনেক গবেষণার পর তিনি আবিষ্কার করলেন কার্বন বা অঙ্গার বায়ুর সংস্পর্শে না এলে আলো উৎপন্ন করতে পারে। কিন্তু কিভাবে এই কার্বনকে বায়ুর সংস্পর্শ থেকে রক্ষা করা যায়?

এডিসন একটি কাচের গোলক তৈরী করলেন, সেই গোলকের মধ্যে কার্বনের ফিলামেন্টটি রেখে গোলকের সমস্ত বায়ু বের করে নিয়ে মুখটি বন্ধ করে দিলেন। এবার কার্বনে বিদ্যুৎ প্রবাহিত করতেই আলো উৎপন্ন হল। কিন্তু সে আলো দীর্ঘস্থায়ী হল না।

এরপর তিনি নানা জিনিস থেকে কার্বন তৈরীর পরীক্ষা চালাতে লাগলেন। শেষপর্যন্ত বাঁশের আঁশকে কার্বনে পরিণত করে বায়ু শূন্য বাল্বে দিয়ে বিদ্যুৎ প্রবাহিত করতেই আলো জ্বলে উঠল। এই আলো জ্বলেছিল দুদিন ধরে।

এরপর এডিসন ১৮৮৩ সালে আরো উন্নত ধরণের একটি ইলেকট্রিক বাল্ব তৈরী করলেন, এই বাল্বের মধ্যে ধাতুর তারের ফিলামেন্ট ও তার সামান্য একটু দূরে একটি ধাতব পাত রাখা থাকত। কোনো ধাতুকে গরম করলে তার থেকে ইলেকট্রন বের হতে থাকে। একে ‘থারমিওনিক এমিশন’ বলে। বাল্বের পাতটিকে পজিটিভ চার্জ দিলে গরম তার থেকে বের হওয়া নেগেটিভ ইলেকট্রনগুলিকে ধাতুর পাত আকর্ষণ করতে থাকে বলে ফিলামেন্ট ও পাতের ভেতর বিদ্যুৎ প্রবাহ ঘটায় আলো উৎপন্ন হয়। কিন্তু পাতটিকে নেগেটিভ চার্জ দিলে সেটি ইলেকট্রন আকর্ষণ না করায় আলো উৎপন্নও হয় না।

এডিসন আবিষ্কৃত এই তথ্যটিকে বলা হয় এডিসন এফেক্ট। এই তথ্য আবিষ্কার করার পর এডিসন বিষয়টির পেটেণ্ট নেন কিন্তু তারপরে বিষয়টি নিয়ে আর পরীক্ষা নিরীক্ষার দিকে তিনি এগোননি।

বেঞ্জিন অণুর গঠন

ফ্রেডরিক আগস্ট কোক্যুলে (১৮২৯—১৮৯৬)

বেঞ্জিন নামক জৈব যৌগটি মাইকেল ফ্যারাডে আবিষ্কার করার পর বেঞ্জিনের পারমাণবিক গঠনগত সঙ্কেত কি হবে সে নিয়ে জার্মান রসায়ন শাস্ত্রবিদ কোক্যুলে ভাবনাচিন্তা করতে শুরু করেন। জৈব যৌগ মুক্ত শৃঙ্খল বা অ্যালিফ্যাটিক ও বদ্ধ শৃঙ্খল বা অ্যারোমেটিক এই দুই ভাগে বিভক্ত। বেঞ্জিনের মধ্যে থাকে ছ'টি কার্বন ও ছটি হাইড্রোজেন পরমাণু। কিন্তু এই কার্বন সারি মুক্ত শৃঙ্খল না বদ্ধ শৃঙ্খল অর্থাৎ বেঞ্জিন কি ধরনের যৌগ সেটা তিনি কিছুতেই বের করতে পারলেন না।

একদিন তিনি দেখলেন এক অদ্ভুত স্বপ্ন। কতগুলি সাপ এঁকে বেঁকে যাচ্ছে। হঠাৎ কিছুদূর আসার পর সাপগুলো গোলাকার হয়ে ঘুরতে লাগল। তারপর ঐ সাপগুলো তাদের মুখ পিছন দিকে বাঁকিয়ে নিজেদের লেজ নিজেরাই গিলতে লাগল। ঘুম ভেঙে গেল বিজ্ঞানী কোক্যুলের।

তিনি ভাবতে লাগলেন তাঁর এরকম স্বপ্ন দেখার কারণ কি? হঠাৎ তাঁর মনে হল বেঞ্জিন অণুর গঠন নিশ্চয়ই বৃত্তাকার শৃঙ্খল। তিনি তখনই বসে গেলেন কাগজ কলম নিয়ে। পেয়ে গেলেন বেঞ্জিনের গঠনগত সংকেত। তিনি আবিষ্কার করলেন বেঞ্জিনের অণু গঠিত হয় কার্বন পরমাণুর মুক্ত শৃঙ্খলের প্রান্তগুলি পরস্পর যুক্ত হয়ে। অণুর গঠন এখানে ষড়ভূজাকৃতি হয়।

অ্যানথ্রাক্স ও জলাতঙ্ক রোগের টিকা (১৮৮১)

লুই পাস্তুর (১৮২২-১৮৯৫)

লুই-এর বাবা যোসেফ পাস্তুরের ছিল চামড়ার ব্যবসা। বাবা চামড়া পাকা করার জন্য চামড়াকে কাঠের পাত্রের মধ্যে নুন দিয়ে ডুবিয়ে রাখতেন। তা দেখে লুই-এর মনে প্রশ্ন জাগত, নুন তো লোকে সুস্বাদু হবে বলে খাবারে দেয়, তবে বাবা চামড়াকে নুনে ডুবিয়ে রাখছে কেন? প্রশ্নের উত্তরে বাবা বলেছিলেন চামড়া যাতে না পচে যায় তার জন্য এই ব্যবস্থা। তখন থেকেই লুই মনে মনে ঠিক করে নিয়েছিল খাদ্য যাতে না পচে যায় বড় হয়ে তার ব্যবস্থা করতে হবে।

১৬৭৩ সালে লীবেন হুক অণুবীক্ষণ যন্ত্র আবিষ্কার করার পর জীব বিজ্ঞানীদের গবেষণায় ক্রমশঃ উন্নতি ঘটতে থাকে। লুই পাস্তুর সর্বপ্রথম এই অণুবীক্ষণ যন্ত্র দিয়ে প্রমাণ করেন মানুষ, জীবজন্তু, গাছপালা প্রভৃতির বহু রোগের প্রধান কারণ হল জীবাণু। এই জীবাণু শুধু জলই নয়, মাটি বা বাতাসেও ঘুরে বেড়ায়।

রসায়ন শাস্ত্র নিয়ে পড়াশোনা করার পর লিল্লে বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা ও গবেষণার কাজ শুরু করেন পাস্তুর।

১৮৬৫ সালে ফরাসী দেশে গুটিপোকার মড়ক দেখা যায়। রেশম শিল্প ছিল ফরাসী দেশের জাতীয় শিল্প। তাই চাষীরা খুবই ক্ষতিগ্রস্ত হতে থাকে। পাস্তুর গুটিপোকার গায়ে এক ধরণের জীবাণু দেখতে পেলেন এবং তখন তিনি জীবাণুগ্রস্ত কীটদের থেকে সুস্থ কীটদের আলাদা করে রাখার ব্যবস্থা করলেন। জীবাণুদের ধ্বংস করার উপায়ও বের করলেন তিনি।

ফ্রান্স ছিল আঙুরের রসের তৈরী মদের জন্য বিখ্যাত একসময় কি এক অজানা কারণে সব মদ নষ্ট হয়ে যাচ্ছিল। পাস্তুর তাঁর অণুবীক্ষণ যন্ত্রের

মাধ্যমে দেখতে পেলেন এর মূলে আছে জীবাণু। পাস্তুর বললেন যে মদকে ১৪০° ফারেনহাইট তাপে গরম করলে সব জীবাণু মরে যাবে ও মদ নষ্টও হবে না। গরম করে জীবাণুমুক্ত করার এই পদ্ধতিকে বলে পাস্তুর-প্রণালী।

ফরাসীদেশে একবার অ্যানথ্রাক্স রোগের কারণে বহু জন্তু জানোয়ার মারা যেতে লাগল। অ্যানথ্রাক্স রোগে মৃত এক পশুর রক্ত পরীক্ষা করে পাস্তুর এক ধরনের জীবাণু দেখতে পেলেন। ঐ জীবাণু সুস্থ পশুর দেহে প্রবেশ করাতে দেখা গেল সেই পশুরও ঐ একই রোগ হয়েছে। পাস্তুর নানা পরীক্ষার পর জানালেন খুব সীমিতভাবে এই রোগের জীবাণু যদি কোনো সুস্থ পশুর দেহে প্রবেশ করানো যায় তাহলে যদিও তার শরীরে ঐ রোগের চিহ্ন অল্প দেখা দেবে তবে ভবিষ্যতে তাদের ঐ রোগ হবে না। ইংলণ্ডের এডওয়ার্ড জেনারের বসন্তের টিকা আবিষ্কার থেকে এই চিন্তাটি তাঁর মাথায় আসে। কিন্তু তাঁর এই বক্তব্য সবাই মেনে নিতে পারছিল না। তখন তিনি ১৮৮১ সালের ২ জুন সবার সামনে একটি পরীক্ষা করে দেখাবার কথা বললেন। পাস্তুর ঐ দিন পঞ্চাশটা ভেড়া এনে তাদের পঁচিশটার দেহে মৃদু অ্যানথ্রাক্সের জীবাণু ঢোকালেন। বাকি পঁচিশটার দেহে কোনো কিছু প্রয়োগ করলেন না। কয়েক দিন পর পঞ্চাশটির দেহে সমপরিমাণে তীব্র অ্যানথ্রাক্স রোগের জীবাণু প্রবেশ করালেন। দেখা গেল আগে টিকা দেওয়া ভেড়াগুলি রোগাক্রান্ত হল না। কিন্তু টিকা না দেওয়া ভেড়াগুলো ঐ রোগে আক্রান্ত হয়ে মারা গেল। এই পরীক্ষার ফলে টিকা দানের পদ্ধতি বা ভ্যাকসিন আবিষ্কার হয়ে চিকিৎসাবিজ্ঞানে অনেক উন্নতি ঘটে।

জলাতঙ্ক রোগের সিরামও আবিষ্কার করেন লুই পাস্তুর। পাস্তুর দেখেছিলেন পাগলা কুকুর, নেকড়ে, শেয়াল প্রভৃতির লালায় জীবাণু বাসা বাঁধে। ঐ লালা থেকেই তিনি এক ধরণের সিরাম প্রস্তুত করে জোসেফ মিস্টার নামে একটি ছোট ছেলের ওপর প্রয়োগ করেছিলেন। সেরে উঠেছিল জোসেফ। ফলে জলাতঙ্ক রোগের হাত থেকে রক্ষা পেল মানুষ।

জীবাণু ঘটিত কোনো কঠিন রোগের হাত থেকে বাঁচবার জন্যই ভ্যাকসিন বা টিকা দেওয়া হয়। কোনো সুস্থ প্রাণীর দেহে টিকা দিলে ঐ রোগের প্রতিরোধী অ্যান্টিবডি তৈরী হয়। এই অ্যান্টিবডিই দেহকে রোগের আক্রমণ থেকে রক্ষা করে।

অ্যানথ্রাক্স, যক্ষা ও কলেরার জীবাণু (১৮৮১)

রবার্ট কখ্ (১৮৪৩-১৯১০)

স্ত্রীর কাছ থেকে জন্মদিনে অণুবীক্ষণ যন্ত্র উপহার পেয়ে জার্মানীর এক সাধারণ চিকিৎসক রবার্ট কখ্ হয়ে উঠেছিলেন পৃথিবীবিখ্যাত জীবাণুবিদ।

সে সময় ইউরোপে গৃহপালিত পশুরা অ্যানথ্রাক্স রোগে আক্রান্ত হয়ে মারা যেত। কিন্তু কোন জীবাণু থেকে এই রোগ হত তা জানা ছিল না চিকিৎসা বিজ্ঞানীদের। রবার্ট কখ্ তাঁর গবেষণা শুরু করেছিলেন এই অ্যানথ্রাক্সের জীবাণু নির্ণয়ের মধ্য দিয়ে।

তিনি প্রথমে অ্যানথ্রাক্সে মৃত ভেড়ার দেহ থেকে রক্ত নিয়ে সেটি অণুবীক্ষণ যন্ত্রের নীচে রেখে পরীক্ষা করে দেখলেন যে সেই রক্তে দণ্ডাকৃতি অসংখ্য জীবাণু রয়েছে। সুস্থ ভেড়ার রক্ত পরীক্ষা করে তিনি ঐরকম কোনো জীবাণু পেলেন না। তখন তিনি অনুমান করলেন ঐ জীবাণুই হয়ত অ্যানথ্রাক্স রোগের কারণ। অনুমানটি সঠিক কিনা পরীক্ষার জন্য তিনি একটি সূঁচকে ফুটন্ত জলে ফেলে জীবাণুমুক্ত করে অ্যানথ্রাক্স রোগে মৃত ভেড়ার দেহের রক্ত কিছুটা নিয়ে সেই রক্ত প্রবেশ করালেন একটি জীবিত ইঁদুরের দেহে। কদিন পরেই ইঁদুরটি অ্যানথ্রাক্স রোগে আক্রান্ত হয়ে মারা গেল। তিনি তাঁর অনুমান সঠিক বলে বুঝতে পারলেন।

এবার ঐ জীবাণুটি নিয়ে শুরু হল নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষা রবার্ট কখ্ দেখলেন খোলা বাতাসে রাখলে ঐ জীবাণুগুলির কর্মক্ষমতা কমে যায়।

অ্যানথ্রাক্স রোগের জীবাণু আবিষ্কার করার পর তিনি এগারো বছর ধরে যক্ষা রোগের জীবাণু অনুসন্ধান করতে লাগলেন। যক্ষা রোগ একবার হলে মানুষের দেহ ক্ষয় হয়ে যায়, শেষপর্যন্ত বাঁচবার আশাও থাকে না। এক বিশেষ ধরনের অণুবীক্ষণ যন্ত্রে এই ক্ষয় রোগের জীবাণুর সন্ধান পেলেন রবার্ট কখ্, এই জীবাণুর গঠন বাঁকা ধরনের। এই জীবাণু অন্য প্রাণীর দেহে প্রবেশ করিয়ে দেখলেন সেই জীবাণু অন্যান্য প্রাণীদেহেও সংক্রামিত হয় এবং জীবাণুর আক্রমণে প্রাণীটি মারা যায়। দীর্ঘ গবেষণার পর তিনি জানতে পারলেন এই জীবাণু বায়ুবাহিত হয়ে সংক্রামিত হয়।

১৮৮১ সালে মিশরে দেখা দিল কলেরা। মহামারীর মত ছড়িয়ে পড়ল এই এশিয়াটিক কলেরা। রোগে আক্রান্ত হওয়ার দশ-বারো ঘণ্টার মধ্যেই রোগী মারা যেতে লাগল। কখ্ এ খবর শুনে তাঁর বিশেষ অণুবীক্ষণ যন্ত্র নিয়ে এবং সহকারী গফ্‌কিকে নিয়ে বার্লিন থেকে চলে এলেন আলেকজান্দ্রিয়ায়।

লুই পাস্তুরও তাঁর দুই সহকর্মী রাউক্‌স ও থুইলিয়ারকে পাঠিয়েছিলেন জীবাণু অনুসন্ধানের জন্য মিশরের আলেকজান্দ্রিয়ায়। কিন্তু থুইলিয়ার নিজেই কলেরায় আক্রান্ত হয়ে মারা গেলেন।

রবার্ট কখ্ আলেকজান্দ্রিয়ার কলেরা রোগীর রক্ত পরীক্ষা করে তাতে কমা আকৃতির জীবাণু পেলেন। পরীক্ষা করে দেখলেন এই জীবাণু মানুষের পেটে জলবাহিত হয়ে প্রবেশ করে সংক্রামিত হয়।

শুধু জীবাণু আবিষ্কারই নয় রক্ত থেকে জীবাণুকে আলাদা করা এবং রক্ত রসের জেলি তৈরী করে তার মধ্যে জীবাণুর বংশবৃদ্ধির উপায়ও তিনি বের করেন।

মোটর গাড়ী (১৮৮৫)

গটলিয়ের ডেইমলার

মানুষ যখন বাষ্পের শক্তিকে আবিষ্কার করল তখনই গতির জগতে এল এক বিরাট পরিবর্তন। ফরাসী দেশের এক ইঞ্জিনিয়ার নিকোলাস কুনো প্রথম আমাদের মোটর গাড়ীর আদিরূপ একটি তিন চাকার গাড়ী বানালেন। এটি চলত বাষ্পীয় ইঞ্জিনের সাহায্যে। গাড়ীর পেছনে বয়লার রেখে সেই বয়লারের বাষ্পকে লাগানো হত চাকা ঘোরাবার কাজে। এই গাড়ীর গতিবেগ ছিল ঘণ্টায় চার মাইল। তবু জনসাধারণ বা সরকারের মন কাড়তে পারলেন না তিনি। তাঁর গাড়ী বাজেয়াপ্ত হল।

হেনরী ফোর্ড

এরপর ডঃ নিকোলাস অটো নামের এক জার্মান ইঞ্জিনিয়ার কুনোর মত আর একটি তিন চাকার গাড়ী বানালেন। গাড়ী তৈরীর কারখানাও বানিয়ে ফেললেন তিনি। তাঁর গাড়ী অবশ্য নিকোলাস কুনোর গাড়ীর থেকে কম বিপজ্জনক ছিল এবং গতিবেগও ছিল বেশী। এই তিন চাকার গাড়ীরই উন্নতি ঘটালেন ১৮৮০ সালে জার্মান ইঞ্জিনিয়ার কার্লবেঞ্জ। আধুনিক মোটর গাড়ীর জনক হলেন তিনিই। তিনি গাড়ী তৈরীর ব্যবসাও শুরু করেন। নিকোলাস

অটোর কারখানায় কাজ করতেন জার্মান ইঞ্জিনিয়ার গটলিয়েব ডেইমলার। পেট্রোল ইঞ্জিন ব্যবহার করে ১৮৮৫ সালে তিনি প্রথম চার চাকার গাড়ী তৈরী করলেন। তাঁর গাড়ীর গতিও ছিল আগের গাড়ীগুলির থেকে অনেক বেশী। চতুর্দিক থেকে তাঁর গাড়ীর চাহিদা বেড়ে গেল। ডেইমলার তখন কার্লবেঞ্জ এর সাহায্য চাইলেন। ফলে তৈরী হল মার্সিডিজ- বেঞ্জ গাড়ী, মার্সিডিজ হল ডেইমলারের মেয়ের নাম।

মোটর গাড়ীর সবদিক দিয়ে উন্নতি ঘটালেন হেনরি ফোর্ড ১৯০৮ সালে। সাধারণ মানুষের জন্য মোটর গাড়ি এই স্লোগান তুলে তিনি তাঁর টি সিরিজের গাড়ির দাম করলেন মাত্র ৮৫০ পাউণ্ড। শুধু মোটর গাড়ী নয়, বাস, লরি সব ধরনের গাড়ীর জন্মদাতা হলেন এই হেনরি ফোর্ড।

স্যাকারিন (১৮৮৬)

ফালবার্গ

১৮৮৬ সালে চিনির থেকেও তিনশো গুণ বেশী মিষ্টি এক ধরনের খাদ্য পাওয়া গেল আলকাতরা থেকে। মিষ্টি স্বাদ হলেও এই খাদ্যটিতে শর্করা থাকে না, তাই বহুমূত্র রোগীদের চিনির বদলে এই খাদ্যটি খেতে বলা হয়। খাদ্যটি হল স্যাকারিন।

জন হপকিন্স বিশ্ববিদ্যালয়ের তরুণ আমেরিকান রসায়নবিদ ছিলেন ফালবার্গ। সে সময় আলকাতরা পাতিত করে পাওয়া গেছিল টলুইন নামক এক প্রকার নতুন যৌগিক পদার্থ। বিজ্ঞানী ফালবার্গ গবেষণা করছিলেন এই টলুইন নিয়েই। দিনের বেশিরভাগ সময়ই তার কেটে যেত এই গবেষণা করতে। একদিন গবেষণা করতে করতে খিদের কথা ভুলে গেছেন। বাড়ী ফিরে তাঁর কাজের মেয়েটিকে বললেন আমার ভীষণ খিদে পেয়েছে। মেয়েটি খাবার এনে দিতেই হাত মুখ না ধুয়েই তিনি গোগ্রাসে খেতে শুরু করলেন।

কিন্তু যাই মুখে দেন, তাই অতিরিক্ত মিষ্টি বলে মনে হয়। শেষমেষ রাগ করে খাবার ফেলে উঠে এলেন। রাগ কমলে ভাবতে বসলেন এরকম মিষ্টি লাগার কারণ কি? কেউ কখনই রান্নায় এত বেশী মিষ্টি দেয় না, অথচ এই অতিরিক্ত মিষ্টত্ব এল কোথা থেকে। হঠাৎ কি মনে হল নিজের হাতের আঙুলে জিভ ঠেকালেন। তখনই বুঝলেন, গবেষণাগারে কাজ করতে করতে তিনি টলুইন থেকে এমন একটা কিছু আবিষ্কার করে ফেলেছেন যা চিনির চেয়েও বহুগুণ মিষ্টি।

গবেষণাগারে এসে অল্প চেষ্টাতেই বের করে ফেললেন পদার্থটি। রঙটি সাদা, নাম দেওয়া হল স্যাকারিন।

অ্যালুমিনিয়ম (১৮৮৬)

চার্লস মার্টিন হল

অতি প্রাচীন যুগ থেকেই রোম দেশের মানুষ না জেনেই অ্যালুমেন নামক এক ধরনের পাথর ব্যবহার করতেন। কিন্তু এই অ্যালুমেন যে কি তা তাঁরা জানতেন না। পরবর্তী যুগে স্যার হামফ্রে ডেভি আবিষ্কার করলেন অ্যালুমেন কোনো মৌলিক পদার্থ নয়। এটি অক্সিজেন ও অপর একটি ধাতু এই দুই উপাদান দিয়ে গঠিত। এই ধাতুটি তিনি বহু পরীক্ষার পরও অ্যালুমেন থেকে নিষ্কাশিত করতে পারেননি। তবে ধাতুটির নামকরণ তিনি করেছিলেন, অ্যালুমিনিয়ম।

নানা গবেষণার পর ১৮২৭ সালে বৈজ্ঞানিক উলার অ্যালুমেনকে পটাশিয়াম দিয়ে বিজারিত করে পেলেন অ্যালুমিনিয়ম ধাতু। কিন্তু সে অতি সামান্য পরিমাণে। কিন্তু এই নিষ্কাশনের পদ্ধতি সহজ ছিল না এবং যথেষ্ঠ পরিমাণে অ্যালুমিনিয়মও পাওয়া যেত না।

দিন দিন অ্যালুমিনিয়ম জনপ্রিয় হয়ে উঠছিল, কারণ এটি লোহার থেকে হাল্কা হলেও খুব শক্ত এবং ক্ষমতাও ছিল লোহার থেকে অনেক বেশী। তার

ওপর এতে কোনো মরচে পড়ার সম্ভাবনা নেই।

এরপর বিজ্ঞানী চার্লস মার্টিন হল গলিত অ্যালুমিনা বা তার ঘন দ্রবণের সঙ্গে নানা ধরণের পদার্থ মিশিয়ে তাতে বিদ্যুৎ চালিয়ে দেখতে লাগলেন অ্যালুমিনিয়ম নিষ্কাশন করা যায় কিনা। শেষপর্যন্ত ১৮৮৬ সালে বিশুদ্ধ অ্যালুমিনার সঙ্গে ক্রায়োলাইট ও ফ্রোরমপার নামক অন্য দুটি অ্যালুমিনিয়মের আকরিক মিশিয়ে তাতে বিদ্যুৎ প্রবাহ চালিয়ে দেখলেন ঋণাত্মক তড়িৎ দ্বারে জমা হচ্ছে অ্যালুমিনিয়ম ধাতু। তখন তিনি বুঝলেন অ্যালুমিনাকে সরাসরি বিদ্যুৎ প্রবাহের মধ্যে রাখলে সেটি বিয়োজিত হয় না। ক্রয়োলাইট মেশানোর জন্য বিদ্যুৎ প্রবাহ দ্বারা আগে সেটি বিয়োজিত হয়ে অ্যালুমিনিয়ম উৎপন্ন করে তারপর ক্রয়োলাইট আকরিকের মধ্যে অ্যালুমিনিয়ম কমে যাওয়ায় সেটি অ্যালুমিনা থেকে অ্যালুমিনিয়মকে নিজের মধ্যে টেনে নেয় ফলে আবার ক্রয়োলাইট আকরিকে রূপান্তরিত হয় এবং আবার বিদ্যুৎ দ্বারা বিয়োজিত হয়ে অ্যালুমিনিয়ম উৎপন্ন করে। এভাবে অ্যালুমিনা ক্রয়োলাইটের মাধ্যমে বিয়োজিত হতে থাকে।

চার্লস মার্টিন হল অ্যালুমিনিয়মের মত এক গুরুত্বপূর্ণ ধাতুর প্রচুর পরিমাণ ও সহজ নিষ্কাশন পদ্ধতি আবিষ্কারের জন্য নোবেল পুরস্কার লাভ করেছিলেন। যদিও মার্টিন হলের মত ফরাসী বিজ্ঞানী হেঁরোও একই সময় অ্যালুমিনিয়ম নিষ্কাশন পদ্ধতি আবিষ্কার করেছিলেন। তবে তাঁর আবিষ্কার পরে প্রচারিত হয়েছিল বলে আবিষ্কারকের মর্যাদা পেয়েছিলেন মার্টিন হলই।

ইনসুলিন (১৮৮৯)

ভন মেরিং ও মিনকোস্কি

মানবদেহের পরিপাক ক্রিয়ার অগ্ন্যাশয়ের ভূমিকা কি এই নিয়ে গবেষণা করছিলেন স্ট্রাসবুর্গ শহরের দুই অধ্যাপক ভন মেরিং ও মিনকোস্কি। গবেষণার জন্য তাঁরা একটি কুকুরের দেহের অগ্ন্যাশয়টি অস্ত্রোপচার করে বাদ দিয়ে

কুকুরটিকে পরীক্ষা করতে থাকেন। একদিন তাঁরা লক্ষ্য করেন কুকুরের মূত্রের ওপর এক ঝাঁক মাছি বসেছে। তখনই ঐ মূত্র পরীক্ষা করে মিনকোস্কি দেখলেন মূত্রের মধ্যে রয়েছে প্রচুর পরিমাণ শর্করা।

তাঁরা তখন অগ্ন্যাশয়টিকে পরীক্ষা করে দেখলেন অগ্ন্যাশয়ে এক ধরণের হরমোন বা উত্তেজক রস পরিপাকের সময় উৎপন্ন হয়। সেটির নাম ইনসুলিন। এটি রক্তের মধ্যে শর্করার পরিমাণ বাড়তে দেয় না। কিন্তু কোনো কারণে এই ইনসুলিন হরমোনের ক্ষরণ কমে গেলে রক্তে শর্করার পরিমাণ বেড়ে গিয়ে বহুমূত্র রোগ হয়।

বিজ্ঞানীরা ১৯২১ সালে কৃত্রিম উপায়ে ইনসুলিন আবিষ্কার করে রোগীকে ইনজেকশন দিয়ে বহুমূত্র রোগের হাত থেকে রক্ষা করার উপায় বের করেছেন।

কৃত্রিম রেশম (১৮৯০)

কাউন্ট হিলারী

প্রাকৃতিক রেশম পাওয়া যায় রেশম কীট থেকে। কিন্তু এই রেশম তৈরীর জন্য গুটিপোকার চাষ, তাদের খাদ্য তুঁতগাছের চাষ, রোগ আক্রমণ প্রতিরোধের ব্যবস্থা রেশম সংগ্রহ এবং তা থেকে সুতো তৈরী ইত্যাদি নানা ঝামেলা পার হতে হয়। বিজ্ঞানীরা এই অসুবিধা দূর করার কথা ভাবছিলেন অনেকদিন ধরেই।

বহুদিন আগে ১৬৬৪ সালে রবার্ট হুক বলেছিলেন কৃত্রিমভাবে রেশম প্রস্তুত করা সম্ভব। কিন্তু কৃত্রিম রেশম প্রস্তুতপ্রণালী তিনি আবিষ্কার করতে পারেননি। এরপর ১৮৫৫ সালে সুইডিস রসায়নবিদ জর্জ য়ুডেমার্স কৃত্রিম রেশম তৈরীর পেটেণ্ট নেন। তিনি মালবেরি ও অন্যান্য গাছের ছালের সেলুলোজ থেকে রেশমের মত তন্তু তৈরী করেন। কিন্তু সেই তন্তু যথেষ্ট শক্ত না হওয়ায় কাপড় বোনা সম্ভব হয়নি।

এরপর ১৮৯০ সালে ফরাসী বিজ্ঞানী কাউন্ট হিলারী প্রথম কাপড়

বোনার উপযোগী শক্ত কৃত্রিম রেশম তৈরী করেন। তিনি মালবেরি গাছের পাতা থেকে এবং পরে তুলা ইথারে ডুবিয়ে তার দ্রবণ থেকে সেলুলোজ নিয়ে কৃত্রিম রেশম তন্তু তৈরী করেছিলেন।

১৯১১ সালে আমেরিকায় আমেরিকান ভিস্‌কোজ কর্পোরেশন নামে এক ব্রিটিশ কোম্পানী প্রথম ব্যবসায়িক ভিত্তিতে কৃত্রিম রেশম তৈরী করতে থাকে।

কাঠ সবচেয়ে সহজলভ্য বলে কাঠ থেকে সেলুলোজ নেওয়া হয়। এই সেলুলোজ গ্রহণ করার জন্য প্রথমে কাঁচা কাঠকে কেটে টুকরো করে গায়ের ছালগুলো তুলে ফেলার পর জলে কয়েকদিন ভিজিয়ে রাখা হয়। ছাল ছাড়ানো কাঠের টুকরোগুলোকে আরো ছোট টুকরো করে কাঠের মধ্যে যে অপদ্রব্য থাকে সেগুলি বিশেষ রসায়নিক পদ্ধতিতে আলাদা করে নেওয়া হয়। এরপর কাঠের টুকরোগুলোকে আরো গুঁড়ো করে কয়েকটি রাসায়নিক পদার্থ যোগ করে আরো ভালো করে ফোটানো হয়। ফলে সব অপদ্রব্য আলাদা হয়ে কাঠটি মণ্ডে পরিণত হয়। এই মণ্ডটাকে আবার ফুটিয়ে কতকগুলি রাসায়নিক প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে অশুদ্ধ সেলুলোজ পাওয়া যায়। ঐ সেলুলোজকে গরম বাষ্পের কাছে রেখে ভালোভাবে শুকিয়ে নিয়ে মেসিনে মিহি গুঁড়ো করে সেই গুঁড়ো নির্দিষ্ট মাত্রায় কস্টিক সোডার দ্রবণের সাথে বিক্রিয়ায় বিশুদ্ধ সেলুলোজ উৎপন্ন করে।

বিশুদ্ধ সেলুলোজকে আবার গুঁড়ো করে কয়েক ঘণ্টা খোলা জায়গায় ফেলে রাখলেন এই সেলুলোজ ধব্‌ধবে সাদা রঙের হয়ে ওঠে। এবার ঐ ক্ষারীয় সেলুলোজের সাথে কার্বন ডাই সালফাইড মিশিয়ে যৌগিক পদার্থ সেলুলোজ জ্যানথেট তৈরী হয়। একে জলের সাথে মিশিয়ে ভালোভাবে নাড়ালে তৈরী হয় অশুদ্ধ ভিসকোজ। অশুদ্ধিগুলো কয়েকটি প্রক্রিয়ায় দূর করে গ্যাস বা বাতাসের সংস্পর্শ ছাড়া ফেলে রাখা হয়।

ভিসকোজকে পুরে দেওয়া হয় ধাতব নলের মধ্যে। নলের মুখে থাকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ছিদ্র। এই মুখটি ডোবানো থাকে পাতলা সালফিউরিক অ্যাসিড দ্রবণের মধ্যে। নলের অপর মুখে চাপ দিয়ে ভিসকোজ সরু সুতোর মত ছিদ্রপথ দিয়ে বেরিয়ে সালফিউরিক অ্যাসিডের সংস্পর্শে এসে শক্ত হয়ে যায়। এই সুতোর মধ্যে কিছু অ্যাসিড লেগে থাকে বলে সুতোকে ভালো

করে জল দিয়ে ধুয়ে ভিজে সুতোর কুণ্ডলী তৈরী করা হয়। সেটি আবার গরম চুল্লীর ওপর রেখে শুকিয়ে নেওয়া হয়। এবার ব্লিচিং মেসিনে সুতো রঙ করা হয়। এরপরও সুতোতে গন্ধক লেগে থাকে। তাই সোডিয়াম সালফাইড দ্রবণ সুতোয় স্প্রে করে গন্ধক দূর করা হয়, এবং ক্ষারীয় ধর্ম দূর করার জন্য তরল অ্যাসেটিক অ্যাসিড সুতোয় দেওয়া হয়। শেষে ভাল করে সাবান জলে ধুয়ে গরম চুল্লীতে শুকিয়ে মেসিনে সুতো পাকিয়ে কাপড় তৈরী করা হয়। কৃত্রিমভাবে প্রস্তুত এই রেশমকে বলে রেয়ন।

রেয়ন রেশমের চেয়ে শস্তা ও শক্ত। রেয়নের জামাকাপড় রেশমের চেয়ে ভারী। এটি রেশমের চেয়ে কম সহজদাহ্য।

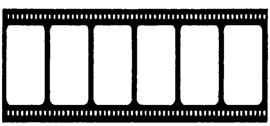

চলচ্চিত্র (১৮৯৩)

টমাস আলভা এডিসন (১৮৪৭—১৯৩১)

১৮৩৩ সালে বিজ্ঞানী হর্নার কতকগুলি স্থির ছবিকে পর পর সাজিয়ে তাড়াতাড়ি চালিত করে ছবিগুলোকে জীবন্ত করে তোলার জন্য একটি খেলনা বানালেন। নাম দিলেন Zeotrohe বা 'জীবন চক্র'।

১৮৬০ সালে মার্কিন বিজ্ঞানী সেলার্স ক্যামেরায় একটি ঘটনার পর প্রতিটি মুহূর্তের পর পর ছবি তুলে একটি চাকার গায়ে সেই ফটোগুলিকে পর পর বসিয়ে একটি যন্ত্র বানালেন। ১৮৬১ সালে পেটেণ্ট নিয়ে যন্ত্রটির নাম দিলেন কিনেম্যাটোস্কোপ। এই যন্ত্রে একটি ঘটনার স্থির ছবিগুলিকে সচল মনে হত।

১৮৭৭ সালে বিজ্ঞানী মায়ব্রিজ ক্যালিফোর্নিয়া স্ট্যাণ্ডফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা লেল্যাণ্ড সাহেবের ঘোড়া ছুটিয়ে যাবার ছবিকে সচল করে তুললেন। এজন্য তিনি খোলা মাঠে চব্বিশটি ক্যামেরা এনে এক প্রান্তে সারি দিয়ে বসালেন। ক্যামেরার শার্টারগুলির সঙ্গে সরু সুতো বেঁধে সুতোর অপর

প্রান্তগুলি মাঠের অপর দিকে টেনে নিয়ে গিয়ে খুঁটির সঙ্গে টান টান করে বেঁধে দিলেন। এবার লেল্যাণ্ডের ঘোড়া ছুটতেই সুতোগুলো ছিঁড়ে গেল এবং তার ফলে শার্টারগুলো খুলেই বন্ধ হয়ে গেল। এভাবে বিভিন্ন অবস্থান অনুযায়ী ছবি তোলা গেল।

এই সব প্রচেষ্টা দেখে বিজ্ঞানী টমাস আলভা এডিসনের মাথায় প্রথম চলচ্চিত্র তৈরীর চিন্তা আসে। তিনি তখন ফোনোগ্রাফ নিয়ে গবেষণা করছিলেন। তাঁর মনে হল ফনোগ্রাফের মত সিলিণ্ডারের গায়ে ছোট ছোট অনেকগুলি ফটো লাগিয়ে হাতল দিয়ে সিলিণ্ডারটিকে যদি ঘোরালে এবং তারপর শক্তিশালী লেন্সে চোখ রাখলে সেই ছবিগুলিকে সচল বলে মনে হওয়া সম্ভব। এই ভাবনা থেকে তিনি তৎকালীন সময়ে মার্কিন বিজ্ঞানী জর্জ ইস্টম্যানের আবিষ্কৃত সেলুলয়েডের ফিল্মে দৃশ্য বস্তুর বিভিন্ন অবস্থানের ছবি তুলে একটি রোলারে সেই ফিল্মগুলিকে গুটিয়ে রাখলেন। এবার একটি বাক্সের মধ্যে ঐ রোলারটি রেখে রোলারটির সঙ্গে লাগানো একটি হাতল বাক্সের বাইরে বের করে রাখলেন। যাতে রোলারটিকে ঘোরানো যায়। এবার বাক্সের ভেতর ঐ রোলারের সঙ্গে আর একটি ফাঁকা রোলার যুক্ত করে দিলেন, যাতে হাতল ঘোরালেই ছবি লাগানো রোলার থেকে ছবি খুলে অন্য রোলারটিতে জড়িয়ে যায়। এবার তিনি বাক্সের সামনে দুটো ছিদ্র করে সেখানে লাগিয়ে দিলেন শক্তিশালী লেন্স। এই যন্ত্রের নাম দেওয়া হল কিনেটোগ্রাফ। কিন্তু এই যন্ত্রে মাত্র দুজনেরই এক সঙ্গে দেখা সম্ভব হত।

প্রদর্শনের জন্যও তিনি ১৮৯৩ সালে একটি যন্ত্র বানিয়েছিলেন। যন্ত্রটির নাম ছিলো কিনেটোস্কোপ। এই যন্ত্রে সেলুলয়েডের লম্বা ফিল্মে পর পর তোলা কতকগুলি ছবি পাঠানো হত। জোরালো আলো দিয়ে সেই ফিল্ম আলোকিত করা হত এবং বড় লেন্সের মাধ্যমে সেই ছবি পর্দার ওপর ফেলা হত। কিন্তু এই ফিল্মের দৈর্ঘ্য ছিল মাত্র পঞ্চাশ ফুট। তেরো সেকেণ্ডে শেষ হয়ে যেত ছবি। এডিসনের এই পদ্ধতিকে ভিত্তি করে টমাস আরমাট্ প্রথম বাক্সের বদলে সরাসরি পর্দার ওপর নির্বাক চলচ্চিত্র প্রদর্শন করেন তারপর পরবর্তীযুগ হল সবাক চলচ্চিত্রের যুগ।

নিষ্ক্রিয় গ্যাস (১৮৯৪)

র‍্যামজে

প্রায় দুশ বছর আগে পর্যন্ত বিজ্ঞানীদের ধারণা ছিল বাতাসে হাইড্রোজেন, কার্বনডাই অক্সাইড, অক্সিজেন ও নাইট্রোজেন এই চার ধরনের গ্যাস আছে। ১৭৮৫ সালে বিজ্ঞানী ক্যাভেণ্ডিস বায়ুমণ্ডলের সর্বত্র নাইট্রোজেনের পরিমাণ সমান কিনা তা পরীক্ষার জন্য গবেষণা শুরু করলেন। এই পরীক্ষা চালানোর সময় একবার কস্টিক সোডা দ্রবণের ওপর অতিরিক্ত অক্সিজেনযুক্ত বায়ু প্রবেশ করিয়ে তাতে বার বার বিদ্যুৎ স্ফুলিঙ্গ প্রয়োগ করে বাড়তি অক্সিজেনকে পটাশিয়াম সালফাইড দিয়ে শোষণ করিয়ে একটি গ্যাসের সন্ধান পেলেন। এই গ্যাসের পরিমাণ মূল বায়ুর ১২০ ভাগের এক ভাগ মাত্র ছিল। পরীক্ষা করে দেখা গেল গ্যাসটি নাইট্রোজেনের থেকেও বেশী নিষ্ক্রিয়। কিন্তু গ্যাসটিকে তিনি নানা পরীক্ষা করেও সনাক্ত করতে পারেননি। এরপর কেটে গেছে ১০০ বছর। ১৮৯৪ সালে বিজ্ঞানী র‍্যালে গ্যাসীয় পদার্থগুলোর ঘনত্ব নির্ণয় করতে গিয়ে দেখলেন রসায়নাগারে প্রস্তত নাইট্রোজেন ও বায়ুমণ্ডলের থেকে পাওয়া নাইট্রোজেনের ঘণত্ব এক নয়। র‍্যালে এই বিষয়ে বারবার পরীক্ষা করলেন, কিন্তু ফল হল একই। তখন তিনি ধারণা করলেন বায়ুমণ্ডলে অজানা কিছু গ্যাস আছে।

র‍্যালের গবেষণার সাহায্য করতে এগিয়ে এলেন বিজ্ঞানী র‍্যামজে। তাঁরা দুজনে আলাদাভাবে বহু পরীক্ষা চালাতে লাগলেন। শেষপর্যন্ত বিজ্ঞানী র‍্যামজে এই নতুন গ্যাসটির সন্ধান পেলেন, গ্যাসটির নিষ্ক্রিয়তার জন্য নাম দেওয়া হল আর্গন বা অলস গ্যাস।

আর্গন আবিষ্কারের বহু দিন আগে বিজ্ঞানীরা পূর্ণ সূর্যগ্রহণের সময় বর্ণালী পরীক্ষা করতে গিয়ে হালকা হলদে রেখা দেখতে পান। বিজ্ঞানীরা মনে করেন এই গ্যাসের বর্ণালী সৌর আবরণেই দেখা যায়। পৃথিবীতে এর কোনো অস্তিত্ব নেই। গ্রীক ভাষায় সূর্যের হেলিওস নামানুসারে এই গ্যাসের

১০০ আবিঃ

নাম রাখা হয় হিলিয়াম। বিজ্ঞানী হিলডে ব্র্যাণ্ড ও ক্লিভাইট প্রথম ইউরেনিয়াম খনিজে এই ধাতুর অস্তিত্বের কথা ঘোষণা করেন। ১৮৯৫ সালে বিজ্ঞানী কাইজার বায়ুতে নিষ্ক্রিয় গ্যাস হিসাবে এর অস্তিত্ব প্রমাণ করেন।

বিজ্ঞানীরা বায়ুর মধ্যে আরো কোনো গ্যাসের অস্তিত্ব আছে কিনা তা খুঁজে দেখার জন্য তরল বায়ুকে নিয়ে গবেষণা শুরু করলেন এবং তরল বায়ুকে অংশ পাতিত করে কয়েকটি নিষ্ক্রিয় গ্যাসের সন্ধান পেলেন। একটির নাম দিলেন নিয়ন বা নতুন গ্যাস, একটির নাম ক্রিপটন বা গুপ্ত গ্যাস এবং আরেকটির নাম জেনন বা আগন্তুক গ্যাস। শেষপর্যন্ত ১৯১৮ সালে তেজষ্ক্রিয়তার ফলে ক্ষয়জাত পদার্থ থেকে রেডন, থোরন ও একটি নন গ্যাস আবিষ্কৃত হয়েছ।

এই নিষ্ক্রিয় গ্যাসগুলি কোনো মৌলিক বা যৌগিক পদার্থের সঙ্গে কাজ করে না, কারণ এদের প্রত্যেকের পরমাণুর বাইরের খোল আটটি ইলেকট্রন দিয়ে পূর্ণ থাকে। বাতাসে এগুলি অতি অল্প পরিমাণে পাওয়া যায়।

এক্সরে (১৮৯৫)

উইলহেলম কনরাড রন্টজেন (১৮৪৫—১৯২৩)

১৮৯৫ সালে একদিন গবেষণা করতে গিয়ে হঠাৎই এক্সরে আবিষ্কার করেছিলেন জার্মানির উজবার্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থবিদ্যার প্রধান অধ্যাপক রন্টজেন। দীর্ঘদিন ধরেই বিজ্ঞানীরা বায়ুশূন্য টিউবে বিদ্যুতের ক্রিয়া নিয়ে গবেষণা করছিলেন। বিজ্ঞানী উইলিয়ম ক্রুক্স একটি বায়ুশূন্য টিউবে বিদ্যুৎ প্রবাহিত করে দেখেন টিউবের নেগেটিভ বা ক্যাথোড প্রান্ত থেকে পজিটিভ বা এ্যানোড প্রান্তের দিকে একটি রশ্মি সবেগে সরলরেখা পথে ছুটে যায়, ঐ রশ্মি চলার পথে কোনো বাধা পেলে তা ভেদ করতে পারে না, সেখানে

অদ্ভুত আলোর সৃষ্টি করে, এই রশ্মি চুম্বক ক্ষেত্রে ক্রিয়া করে। বিজ্ঞানী গোল্ডস্টোন এই রশ্মির নাম দেন ক্যাথোড রশ্মি। এই রশ্মি হল নেগেটিভ চার্জ কণিকা বা ইলেকট্রন কণিকার সমষ্টি।

বিজ্ঞানী রন্টজেন একদিন এই ক্রুকস টিউবে ক্যাথোড রশ্মি তৈরী করে গবেষণা করছিলেন। টেবিলের ওপর পড়ে ছিল বেরিয়াম প্লাটিনোসায়ানাইড মাখানো একটি ফটোগ্রাফিক প্লেট। সেদিন তিনি ক্রুকস টিউবকে কালো কাগজে ঢেকে পরীক্ষা করছিলেন। হঠাৎ চোখ পড়ল পাশে পড়ে থাকা প্লেটটি সবুজ রঙের আলোয় আলোকিত হয়ে উঠেছে। তিনি ভাবলেন ক্যাথোড রশ্মি তো কোনো বাধা ভেদ করতে পারে না, আর ক্রুকস টিউবকে তিনি ঢেকে রেখেছেন কালো কাগজে, তাহলে অদৃশ্য কোনো রশ্মি কি প্লেটটিকে আলোকিত করে তুলল? এবার তিনি ঐ প্লেটের সামনে নিজের হাতটা তুলে ধরলেন। কিন্তু হাতের ছায়া পড়ল না। ফুটে উঠল হাতের হাড়গুলির ছায়া।

তিনি বুঝলেন সাধারণ রশ্মিকে যে সব জিনিস বাধা দেয় সেগুলি এই রশ্মিকে বাধা দিতে পারে না, তাই হাতের মাংস ভেদ করে হাড়ের ছায়া ফুটে উঠেছে। এবং এভাবেই ক্রুকস টিউবের কাচ ও কালো কাগজ ভেদ করে আলো এসে পড়ছে প্লেটটিতে। দেখা গেল যে বস্তুর ঘণত্ব বেশী সেখান দিয়ে এই আলো যেতে পারে না। যেমন লোহা, তামা, পাথর, হাড় প্রভৃতি। তিনি আবিষ্কার করলেন যখন ক্রুকস টিউবের মধ্যে বিদ্যুৎ প্রবাহিত করায় ক্যাথোড প্রান্ত থেকে ক্যাথোড রশ্মি নির্গত হয় তখন সেই রশ্মি কোনো জিনিসে বাধা পেলে এক অসাধারণ রশ্মির সৃষ্টি করে।

এই রশ্মির কি পরিচয় তা তিনি বের করতে পারেননি তাই নাম দিয়েছিলেন অজানা রশ্মি বা এক্সরে। তাঁর নামানুসারে এই রশ্মির নাম দেওয়া হয়েছে রণ্টজেন রশ্মি। চিকিৎসা বিজ্ঞানের নানা কাজে এই রশ্মিকে ব্যবহার করা হয় ১৯০১ সালে এই আবিষ্কারের জন্য রণ্টজেন নোবেল পুরষ্কার পেয়েছিলেন।

বেতার যন্ত্র (১৮৯৫)

জগদীশচন্দ্র বসু (১৮৫৮—১৯৩৭)

১৮৮২ সালে আমেরিকার ইঞ্জিনিয়ার ইয়ানস্কি একদিন কানে ইয়ার ফোন লাগিয়ে একটি কাজে ব্যস্ত ছিলেন। হঠাৎ ইয়ার ফোনের মাধ্যমে তার কানে একটি মৃদু শব্দ এল। শব্দ সৃষ্টি হওয়ার কোনো কারণ তিনি খুঁজে পেলেন না। দীর্ঘকাল ধরে তিনি ঐ শব্দ কোথা থেকে এল তা জানার জন্য গবেষণা চালালেন কিন্তু কোনো সিদ্ধান্তে আসতে পারলেন না।

জার্মান বিজ্ঞানী ম্যাক্সওয়েল শব্দ ও আলোক তরঙ্গ নিয়ে গবেষণা করছিলেন। তিনি ১৮৮৩ সালে জানালেন ঐ শব্দটি বিশ্বের বাইরে থেকে আগত এক ধরনের শক্তিতরঙ্গ।

১৮৮৭ সালে জার্মান বিজ্ঞানী হার্ৎস ঐ শক্তিতরঙ্গের উৎস সম্পর্কে আরো নতুন তথ্য জানালেন এবং তাঁর ল্যাবরেটরিতে সেই তরঙ্গ সৃষ্টিও করলেন। তাঁর গবেষণার মাধ্যমে জানা গেল মহাকাশের নক্ষত্রগুলির মধ্যে যে পারমাণবিক বিস্ফোরণ হয়ে চলেছে তার থেকে এক ধরণের তরঙ্গ উৎপন্ন হয়ে সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে। এই তরঙ্গ এক ধরনের শক্তি, যে শক্তি ও আলোকশক্তির সমগোত্রীয়। কিন্তু একে ইন্দ্রিয় দিয়ে অনুভব করা যায় না। মেঘে বিদ্যুৎ স্ফূরণের সময় তাপ ও আলো সৃষ্টির সাথে এই তরঙ্গও সৃষ্টি হয়। এই তরঙ্গের দৈর্ঘ্য আলোকরশ্মির তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের চেয়ে বেশী হলেও কম্পাঙ্ক কম। তাই এই শক্তি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নয়। এই শক্তির তরঙ্গের নাম দেওয়া হয় বেতার তরঙ্গ। ইতিমধ্যে বিজ্ঞানীরা বেতার তরঙ্গ সম্বন্ধে আরো

কিছু তথ্য আবিষ্কার করে ফেলেছেন। সেগুলি হল এ তরঙ্গ যন্ত্র দিয়ে সৃষ্টি করা যায়। এবং বৈদ্যুতিক গ্রাহক যন্ত্র দিয়ে সে তরঙ্গকেও ধরা যায়। বেতার তরঙ্গের সঙ্গে আলো ও শব্দ তরঙ্গ ও বহুদূরে পাঠানো সম্ভব।

১৮৯৫ সালে কলকাতার টাউন হলে ছোটলাটের সভাপতিত্বে আয়োজিত হল এক সভা। সে সভায় বিজ্ঞানী জগদীশচন্দ্র বসু তাঁর তৈরী স্বল্প দৈর্ঘ্যের বেতার তরঙ্গ সৃষ্টিকারী যন্ত্র দিয়ে শব্দ তরঙ্গকে বেতার তরঙ্গে পরিণত করে প্রমাণ করেন বিনা তারে এক জায়গা থেকে অপর জায়গায় বেতার তরঙ্গ পাঠানো সম্ভব। বেতার তরঙ্গ ধরার জন্য তিনি 'কোহেরার' নামক একটি সূক্ষ্ম যন্ত্রও তৈরী করেন। বেতার তরঙ্গ নিয়ে তিনি দীর্ঘকাল গবেষণা করেছিলেন। কিন্তু তিনি ছিলেন পরাধীন ভারতের বিজ্ঞানী, তাই প্রচারের সুযোগ তিনি পাননি। এবং দেশের মানুষও তার বিজ্ঞানচর্চার যথার্থ মর্ম উপলব্ধি করতে পারেনি। বেতার তরঙ্গ বিনা তারে প্রেরণের কৌশল অর্থাৎ বেতার যন্ত্র আবিষ্কার করা সত্ত্বেও সরকারী সহযোগিতার অভাবে তার পেটেন্ট নেওয়া তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়নি।

শেষপর্যন্ত বেতার যন্ত্র আবিষ্কারের স্বীকৃতি পান বিজ্ঞানী মার্কনি। মার্কনির জন্ম ১৮৭৪ সালে ইতালীতে। তিনিও বেতার তরঙ্গ নিয়ে নানারকম গবেষণা শুরু করেছিলেন। বিজ্ঞানী হার্ৎসের গবেষণা তাঁকে এ কাজে আরো সাফল্য এনে দেয়।

নিউ ফাউন্ডল্যাণ্ডের সমুদ্র উপকূলে মার্কনি তাঁর কয়েকজন সহকর্মী নিয়ে তারের সুতোয় বাঁধা প্রকাণ্ড ঘুড়ি আকাশে ওড়াতেন। এবং সেই তারের সঙ্গে টেলিফোন যন্ত্র লাগিয়ে কান পেতে শুনতেন। শেষ পর্যন্ত ১৮৯৬ সালে ২২ বছরের যুবক মার্কনি রিসিভার কানে লাগিয়ে পরিষ্কার শুনতে পেলেন টক্কা-টক্কা-টক্কা-সংকেত ধ্বনি। এই সংকেত ধ্বনি আসছিল আটলান্টিক মহাসাগরের অপর পারে তিন হাজার মাইল দূরে দক্ষিণ কর্ণওয়াল থেকে। শেষপর্যন্ত ১৯০১ সালে বিনা তারে মুখের কথাকে তিনি ইংলিশ চ্যানেল পার করে দিয়ে বেতার যন্ত্র আবিষ্কারকের খ্যাতি লাভ করেন।

বেতার বার্তা প্রচারের জন্য প্রচার কেন্দ্রে থাকে একটি প্রেরক যন্ত্র ঐ যন্ত্রের মাধ্যমে উচ্চ বিদ্যুৎ তরঙ্গ সৃষ্টি করে তার সাথে শব্দ তরঙ্গ যুক্ত করে প্রচার যন্ত্রের সাথে যুক্ত এরিয়ালের মাধ্যমে মহাকাশে নিক্ষেপ করা হয়।

পৃথিবীকে ঘিরে থাকা বায়ুমন্ডলের সবচেয়ে উপরের স্তর আয়নমণ্ডলে বাধা পায়। এই আয়নমণ্ডল হল একটি তড়িৎ পরিবাহী স্তর। আয়নমণ্ডলে বেতার তরঙ্গ বাধা পেয়ে নেমে আসে পৃথিবীর বুকে। গ্রাহক যন্ত্রের মাধ্যমে সেই বেতার তরঙ্গকে ধরা যায় এবং ঐ যন্ত্রের এক বিশেষ যান্ত্রিক ব্যবস্থায় বেতার তরঙ্গের সাথে যুক্ত শব্দ তরঙ্গকে আমরা শুনতে পাই। বেতার তরঙ্গের গতিবেগ আলোকের গতিবেগের সমান। তাই বেতার তরঙ্গ আয়নমণ্ডলে প্রতিফলিত হয়ে ফিরে আসতে বেশী সময় লাগে না।

১৯৯৭ সালে এক বিশেষ সমীক্ষায় প্রমাণিত হয় জগদীশচন্দ্রই বেতার যন্ত্রের আবিষ্কারক। মার্কনির আগেই তিনি বেতারযন্ত্রের আবিষ্কার করেছিলেন এ তথ্য আজ প্রমাণিত। এই মহান বিজ্ঞানীর মৃত্যুর ষাট বছর পর সারা বিশ্ব তাঁকে বেতার যন্ত্রের আবিষ্কারক হিসাবে স্বীকৃতি দেয়।

তেজস্ক্রিয় পদার্থ (১৮৯৬)

হেনরী বেকারেল

১৮৯৬ সালে হেনরি বেকারেল নামের এক ফরাসী বিজ্ঞানী ইউরেনিয়াম সালফেট নামক একটি যৌগিক পদার্থ নিয়ে পরীক্ষা করছিলেন। একদিন তিনি তাঁর গবেষণাগারের একটি আলমারীতে একটি ফটোগ্রাফিক প্লেটকে কালো কাগজে মুড়ে রেখে দিয়েছিলেন। সেই কাগজে মোড়া প্লেটের ওপর রেখেছিলেন একটি চাবি ও ইউরেনিয়াম ধাতুকে। সেটিও কাগজে মোড়া ছিল। ক'দিন পর প্লেটটা ডেভলাপ করতে গিয়ে দেখেন তাতে চাবির ছবি। তখন তিনি সিদ্ধান্তে এলেন যে ইউরেনিয়াম থেকে সবসময়ই স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে এক ধরনের রশ্মি বিকিরিত হয়। ঐ রশ্মি ধাতুর পাত ভেদ করে চলে যেতে পারে এবং অন্ধকারেও ফটোগ্রাফিকে প্লেটের ওপর কাজ করে।

হেনরি বেকারেল আরো পরীক্ষার পর জানতে পারলেন ঐ রশ্মি যখন কোনো গ্যাসীয় বা বায়ু মাধ্যমে প্রবাহিত হয় তখন গ্যাস বা বায়ুকে আয়নিত

করে।

প্রকৃতিতে এমন কিছু কিছু মৌলিক পদার্থ আছে যেগুলি থেকে সব সময়ই এক ধরণের রশ্মি নির্গত হয়। এই রশ্মি বিকিরণ ক্ষমতাকে বলে তেজষ্ক্রিয়তা, এবং ঐ সব মৌলিক পদার্থগুলিকে বলে তেজষ্ক্রিয় পদার্থ। ইউরেনিয়াম, থোরিয়াম, রেডিয়াম, প্লুটোনিয়াম প্রভৃতি ধাতুগুলি হল তেজষ্ক্রিয় পদার্থ।

ইউরেনিয়ামের থেকেও ইউরেনিয়ামের আকরিক পিচব্লেণ্ডের তেজষ্ক্রিয়তা অনেক বেশী। এই পিচব্লেণ্ড থেকেই ফ্রান্সের বিজ্ঞানী পিয়ের ক্যুরি ও মেরী ক্যুরি আবিষ্কার করেছিলেন রেডিয়াম নামক আরেকটি তেজষ্ক্রিয় মৌলিক পদার্থ।

মারকিউরাস নাইট্রেট (১৮৯৬)

প্রফুল্লচন্দ্র রায় (১৮৬১-১৯৪৪)

১৮৮৮ সালের আগষ্ট মাসের প্রথম সপ্তাহে কলকাতা বন্দরে ভিড়ল এক জাহাজ। জাহাজ থেকে নামলেন ইংল্যাণ্ড থেকে বিজ্ঞানে ডক্টরেট ডিগ্রী পাওয়া এক ভারতীয়। পকেটে পয়সা নেই তাঁর। জাহাজের কেবিনেই তাঁর জিনিসপত্র জামিনে রেখে জাহাজের এক কর্মচারীর কাছে আট টাকা ধার নিলেন। তারপর সোজা গেলেন এক বন্ধুর বাড়ী, বন্ধুর কাছ থেকে একটি ধুতি ও চাদর চেয়ে বিদেশী পোশাক ছেড়ে পরে নিলেন দেশীয় পোশাক। তারপর থেকে দেশীয় পোশাক ছাড়া অন্য কোনো পোশাকে দেখা যায়নি সেই ভারতীয়কে। বিলেত থেকে ফেরার কোন খবর তিনি পাঠাননি বাড়ীতে। যদি খবর পেয়ে অর্থের অপব্যয় করে বাড়ীর লোকেরা খুলনার বাড়ুলি গ্রাম

www.purepdfbook.com

থেকে কলকাতায় চলে আসে! এই ব্যক্তি হলেন আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়।

প্রফুল্লচন্দ্র এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয়ে ১৮৮৫ সালে বি এস সি পাশ করার পর অজৈব রসায়ন শাস্ত্র নিয়ে গবেষণা করতে থাকেন। ১৮৮৭ সালে তিনি ডি. এস. সি হন। দেশে ফিরে ১৮৮৯ সালের প্রথমদিকে প্রেসিডেন্সী কলেজে রসায়ন শাস্ত্রের অধ্যাপক হন এবং সর্ষের তেল, ঘি, বিভিন্ন খনিজ পদার্থ নিয়ে গবেষণা করতে থাকেন।

প্রফুল্লচন্দ্র বুঝতেন ইংরেজ ও দেশীয় পুঁজিপতিরা গরীব ভারতবাসীকে শোষণ করছে। তাই তিনি সরকারী চাকরীর নেশা থেকে বাঙালী যুবকদের মুক্ত করার জন্য বলতেন 'অন্ন সমস্যার মীমাংসা করতে পারলে সঙ্গে সঙ্গে অনেক সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে। তাই ব্যবসা ছাড়া আমার আর কিছু বলার নেই।' তিনি এও বলতেন যে 'মূলধন ব্যবসার বাধা নয়, ইচ্ছাই হল মূলকথা।' বিজ্ঞানচর্চা ও ব্যবসা-বাণিজ্য করাকেই তিনি দেশের উন্নতির শ্রেষ্ঠ পথ বলে মনে করতেন। তাই মাত্র সাতশো টাকা মূলধন নিয়ে তিনি 'বেঙ্গল কেমিক্যাল অ্যাণ্ড ফার্মাসিউটিক্যাল ওয়ার্কস' নামক একটি রসায়ন শিল্প প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেছিলেন। যা এখন ভারতের শ্রেষ্ঠ প্রতিষ্ঠান।

১৮৯৫ সালে তিনি মারকিউরাস নাইট্রেট নামক এক যৌগিক পদার্থ আবিষ্কার করে জগৎজোড়া খ্যাতি পান। পারদের সঙ্গে হাল্কা নাইট্রিক অ্যাসিড মেশালে মারকিউরাস নাইট্রেট নামক যৌগিক পদার্থটি পাওয়া যায়। এই পদার্থটিকে আমরা বলি রস সিন্দুর। এই আবিষ্কারের ফলে পারদের যৌগের একটি সংখ্যা বৃদ্ধি পায়।

ক্যাথোড রশ্মি (১৮৯৭)

জে জে থমসন

গেসলার নামক এক বিজ্ঞানীই প্রথম বায়ুশূন্য জায়গায় বিদ্যুতের আশ্চর্য্য কার্যকলাপ লক্ষ্য করেন। তিনি একটি সরু কাচের নলের দু প্রান্তে দুটি

www.purepdfbook.com

প্লাটিনাম তার বসান। এবার নলের বেশীর ভাগ বাতাস বের করে নিয়ে তিনি সেই নলের মধ্যে বিদ্যুৎ প্রবাহিত করে দেখেন নলের মধ্যে এক আশ্চর্য আলোর সৃষ্টি হচ্ছে। নলের ভিতর যদি খুব কম হাইড্রোজেন গ্যাস থাকে, তবে গোলাপী আলো আর যদি খুবই কার্বন ডাই অক্সাইড গ্যাস থাকে তবে সাদা আলো দেখা যায়। এইরকম টিউবের নাম দেওয়া হয়েছিল গেসলার টিউব।

এরপরে ইংরেজ বিজ্ঞানী উইলিয়ম ক্রুকস এমন একটি টিউব তৈরী করলেন যার ভেতরের বাতাস ধীরে ধীরে বের করে নেওয়া যায়। টিউবে ক্যাথোড ও অ্যানোড দুটি তড়িৎ দ্বার করলেন। এবার টিউবের বাতাসের চাপ ০.১০ মিঃ মিঃ পারদ স্তম্ভের সমান করে ক্যাথোড ও অ্যানোড প্রান্ত বিদ্যুৎ উৎপাদক যন্ত্রের সঙ্গে লাগিয়ে টিউবের মধ্যে তড়িৎ প্রবাহিত করে দেখলেন ক্যাথোড তড়িৎদ্বার থেকে এক ধরণের রশ্মি খুব দ্রুত অ্যানোড তড়িৎদ্বারের দিকে ছুটে গেল এবং কাচের গায়ে ধাক্কা পেয়ে এক অদ্ভুত আলোর সৃষ্টি করল। এ রশ্মি প্রকৃতপক্ষে কি তা বিজ্ঞানী ক্রুক্স বের করতে পারেননি।

জার্মান বিজ্ঞানী গোল্ডস্টোন লক্ষ্য করেন এই রশ্মি নেগেটিভ তড়িৎ দ্বার থেকে বিচ্ছুরিত হয় এবং বিদ্যুৎটি নেগেটিভ। তাই তিনি এই রশ্মির নাম দেন ক্যাথোড রশ্মি।

পরবর্তীকালে ১৮৯৭ সালে জে জে থমসন ইলেকট্রন আবিষ্কার করে প্রমাণ করেন ক্যাথোড রশ্মি হল ইলেকট্রন কণিকার সমষ্টি। ক্রুকস টিউবের মধ্যে অতি সামান্য পরিমাণে গ্যাসীয় পদার্থ থাকায় তার থেকেই ইলেকট্রনের সৃষ্টি হয়েছে। তিনি প্রমাণ করে দেখান ক্যাথোড রশ্মিতে নেগেটিভ চার্জ আছে। এবং এর কিছুটা ভরও রয়েছে। এবং এই চার্জ ও ভরের অনুপাত সব ক্ষেত্রে সমান থাকে।

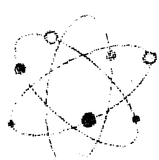

www.purepdfbook.com

ম্যালেরিয়া (১৮৯৭)

রোনাল্ড রস (১৮৫৭—১৯৩২)

ম্যালেরিয়া কথাটির মধ্যে আছে দুটি শব্দ ম্যাল ও এয়ার। ম্যাল অর্থ দূষিত, এয়ার অর্থ বাতাস। আগেকার লোকেদের ধারণা ছিল দূষিত বাতাসের জন্যই ম্যালেরিয়া জ্বর হয়। ম্যালেরিয়া জ্বর হলে গা কাঁপুনি দিয়ে জ্বর আসে, রোগীর জল তেষ্টা পায়, হাত-পা অবশ হয়ে যায় আর দেহ ক্রমশঃ নির্জীব হয়ে পড়ে। ম্যালেরিয়া রোগের প্রকোপে মহামারীর মত লোক একসময় মারা যেত।

ফরাসী ডাক্তার চার্লস লেভেরাঁ ১৮২৮ সালে প্রথম ম্যালেরিয়া রোগীর রক্তে প্লাসমোডিয়াম নামে এক পরজীবী জীবাণু দেখতে পান। তিনি বুঝতে পারেন প্লাসমোডিয়ামই ম্যালেরিয়া রোগের কারণ। গবেষণায় জানা যায় প্লাসমোডিয়াম অতিক্ষুদ্র এককোষী প্রাণী, আমাদের রক্ত কণিকার মধ্যে এরা বংশবিস্তার করে। এই আবিষ্কারের জন্য ১৯০৭ সালে লেভেরাঁ নোবেল পুরস্কার পান।

প্যাট্রিক ম্যানসন নামক এক বিজ্ঞানী গবেষণা করে বলেছিলেন কিউলেক্স মশার কামড়ে ফাইলেরিয়া রোগ হয়। রোনাল্ড রসেরও মনে হয়েছিল ম্যালেরিয়া রোগের জীবাণু হয়তো মশাই বহন করে। প্যাট্রিক ম্যানসনের মশা নিয়ে গবেষণা থেকে অনুপ্রেরণা পেয়ে রোনাল্ড রস মশা নিয়ে ভারতের কলকাতার পি.জি হাসপাতালে পরীক্ষা নিরীক্ষা শুরু করেন।

১৮৮৫ সালে রোনাল্ড রস ভারতে এসে ব্রহ্মদেশ থেকে আফগানিস্তান পর্যন্ত ঘুরে শেষে কলকাতায় এসে বিভিন্ন ধরনের মশা পরীক্ষা করে বুঝলেন সব জাতের মশা ম্যালেরিয়া রোগের জীবাণু বহন করে না। ১৮৯৭ সালের ২০ জুন এক হাজারটা মশা পরীক্ষা করে তিনি আবিষ্কার করলেন মশার পাকস্থলীতে ম্যালেরিয়ার জীবাণু প্লাসমোডিয়াম আশ্রয় নেয়। এই জীবাণু চারবার নির্দিষ্ট সময় অন্তর আকৃতি পরিবর্তন করে ডিম্বানু অবস্থায় পৌঁছায়। এই মশার ডিম্বাণু অবস্থাতেই মশার কামড় সুস্থ মানুষের দেহের রক্তে সংক্রমণ ঘটাতে পারে। আক্রান্ত ব্যক্তির থেকে আবার মশার কামড়ে

www.purepdfbook.com

ম্যালেরিয়া চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে।

রস লক্ষ্য করে দেখলেন ডানায় ছোট ছোট ফুটকিওলা এক ধরণের মশা, যারা লেজটি ওপরে তুলে দেওয়ালের গায়ে বসতে পারে সেই মশাদের পাকস্থলীতেই এই পরজীবী জীবাণু আশ্রয় নেয়। তাই তিনি কয়েকটি ঐ জাতের মশা ধরে ম্যালেরিয়া রোগগ্রস্ত ব্যক্তির রক্তপানের সুযোগ দিলেন। তারপর ঐ মশাগুলির পাকস্থলী অনুবীক্ষণ যন্ত্র দিয়ে পরীক্ষা করে দেখলেন পাকস্থলীতে জীবাণুর প্রচুর ডিম্বাণু রয়েছে। ডিম্বাণু কোষের গায়ে ডজনখানেক ছোট ছোট ফুটকিও রয়েছে। তিনি আরো পরীক্ষা করে দেখলেন এই মশা স্ত্রী জাতীয়। এদের পাকস্থলী থেকে লালাগ্রন্থির মাধ্যমে ম্যালেরিয়ার পরজীবী জীবাণু মশার মুখে আসে। সুস্থ মানুষকে কামড়ালে তখন ঐ জীবাণু মানুষের রক্তে মিশে যায়।

রোঁনাল্ড রস ম্যালেরিয়া দমনের উপায় হিসাব 'দ্য প্রিভেনসন অফ ম্যালেরিয়া' নামের একটি বই লিখেছিলেন। ম্যালেরিয়া রোগের কারণ আবিষ্কারের জন্য তাঁকে ১৯০২ সালে নোবেল পুরস্কার দেওয়া হয়।

রস ম্যালেরিয়ার জীবাণু বহনকারী মশার জাত নির্ণয় করতে পারেননি। গ্রাসী নামক এক বিজ্ঞানী প্রমাণ করে দেখান অ্যানোফিলিস ক্লাভিজার নামক মশা ম্যালেরিয়া রোগ সংক্রমণ ঘটায়।

গ্যালালিথ বা কেসিন প্লাস্টিক (১৮৯৮—৯৯)

১৮৭২ সালে জার্মান রসায়নবিদ এডলফ ভন বাইয়ার আবিষ্কার করেন যে যখন বিভিন্ন ফেনোল জাতীয় বস্তু ও এ্যালডিহাইডের বিক্রিয়া ঘটে তখন তার থেকে এক ধরনের রজন জাতীয় বস্তু তৈরী হয়। এই রজন জাতীয় বস্তু অবশ্য ১৯০৭ সালে বেকেলান্ডই প্রথম কাজে লাগান।

এই আবিষ্কারের পর থেকেই ফরম্যালডিহাইড গবেষণা শুরু হয়। ১৮৯৮ সাল থেকে ১৮৯৯ সালে দুজন জার্মান রসায়নবিদ ব্ল্যাকবোর্ডের শ্লেটের

www.purepdfbook.com

বদলে ব্যবহার করা যেতে পারে এরকম পদার্থ আবিষ্কার করার কথা ভাবছিলেন।

একদিন গবেষণা করতে করতে ফরম্যালডিহাইডের পাত্রের মধ্যে খাবার ছানা কিছুটা পড়ে যায়। ফরম্যালডিহাইডের সঙ্গে ছানা বা caesin-এর বিক্রিয়ায় শক্ত শিংয়ের মত কঠিন সাদা একটি পদার্থ সৃষ্টি হয়। আবিষ্কৃত হয় কেসিন প্লাস্টিক। ১৯০০ সাল থেকে বাণিজ্যিকভাবে এই কেসিন প্লাস্টিকের ব্যবহার শুরু হয়। এর বাণিজ্যিক নাম দেওয়া হয় গ্যালালিথ। (Gala অর্থ দুধ, Lithos অর্থ পাথর।)

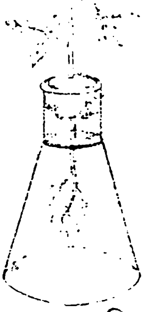

জীব ও জড়ের সংবেদনশীলতা (১৯০১)

জগদীশচন্দ্র বসু (১৮৫৮-১৯৩৭)

বেতার তত্ত্ব আবিষ্কার করে বিনাতারে শব্দ পাঠাবার কৌশল প্রথম আবিষ্কার করেছিলেন ভারতীয় বিজ্ঞানী জগদীশচন্দ্র। ১৮৯৫ সালে বাংলার লাটসাহেবের সামনে তিনি বেতার টেলিগ্রাফীর ব্যবহারও দেখান। কিন্তু তিনি সাধনার ফলকে টাকা রোজগারের উপায় হিসাবে নিতে রাজী ছিলেন না, তাই বেতার যন্ত্র আবিষ্কারকরূপে নাম ছড়াল মার্কনীর। যদিও আজ একশো বছর পরে জগদীশচন্দ্রকেই সেই স্বীকৃতি দেওয়া হচ্ছে।

বেতার তরঙ্গের ওপর বিশেষভাবে গবেষণার জন্য জগদীশচন্দ্র পদার্থবিদ্যা ছেড়ে ধাতু ও উদ্ভিদ বিষয়ে গবেষণা করতে থাকেন এবং ক্রেসকোগ্রাফ, পোটোমিটার, স্ফিগমোগ্রাফ, ফটোসিনথেটিক বাবলার প্রভৃতি যন্ত্রের আবিষ্কার করেন।

বেতার তরঙ্গ ধরার জন্য তিনি কোহেরার নামে একটি সূক্ষ্ম যন্ত্র তৈরী করেছিলেন। তিনি লক্ষ্য করেছিলেন বহুক্ষণ ব্যবহার করলে কোহেরার-এর কার্যক্ষমতা কমে যায়। আবার কিছুক্ষণ বিশ্রাম দিলে কার্যক্ষমতা স্বাভাবিক হয়ে যায়। এর থেকে তাঁর মনে হয় ধাতুরও বোধ শক্তি আছে।

www.purepdfbook.com

১৯০১ সালের ১০ মে বিজ্ঞানী জগদীশচন্দ্র লণ্ডনের রয়্যাল সোসাইটীর সভাগৃহে পরীক্ষা করে দেখান যে উদ্ভিদ ও ধাতুর অনুভূতি আছে। উদ্ভিদের নাড়ীর স্পন্দন একটি আলোক বিন্দুর সাহায্যে দেখানোর জন্য তিনি নিজে একটি যন্ত্র তৈরী করেন। যন্ত্রটি একটি শিকড় সমেত গাছের সাথে লাগিয়ে দেন। গাছটিকে ব্রোমাইডের পাত্রে কাণ্ড পর্যন্ত ডুবিয়ে দেন। যন্ত্র থেকে আসা আলোকবিন্দু একটি পর্দার ওপর পড়তে থাকে।

আলোকবিন্দুটি প্রথমে ঘড়ির দোলকের মত নির্দিষ্ট মাপে দুলছিল। ক্রমে আলোটি দ্রুত দুলতে লাগলো এবং একটু পরেই প্রচণ্ড ঝাঁকুনি দিয়ে থেমে গেল। অর্থাৎ ব্রোমাইড বিষে উদ্ভিদের মৃত্যু হল।

জগদীশচন্দ্র সেদিন একটি বিশেষ যন্ত্রের সাহায্যে জড় পদার্থেরও উত্তেজনায় সাড়া দেবার ক্ষমতা আছে তা প্রমাণ করেছিলেন। তিনি একটি অভ্রের পাত নিয়ে তাতে বিষ প্রয়োগ করে পাতটির সামনে রাখলেন ঐ বিশেষ যন্ত্রটি। বিষ প্রয়োগের ফলে অভ্রের পাতের মধ্যে শুরু হল কম্পন এবং তা ধরা পড়ল ঐ যন্ত্রে। টিনের পাতের সামনে ঐ যন্ত্রটি রেখে টিনের পাতে বিদ্যুৎ স্পর্শ ঘটিয়ে যন্ত্রের মাধ্যমে কম্পন ধরা গেল। এভাবে তিনি প্রমাণ করলেন উদ্ভিদ ও ধাতুরও প্রাণ আছে।

তাঁর এই দুটি পরীক্ষা সকলকে মুগ্ধ করলেও কয়েকজন শারীরতত্ত্ববিদ কড়া সমালোচনা করতে ছাড়লেন না। তাঁরা রয়্যাল সোসাইটীর কাছে আবেদন করলেন জগদীশচন্দ্রের বক্তৃতা যেন প্রকাশ না পায়। জগদীশচন্দ্রও তাঁর বক্তৃতার কোনো পরিবর্তনে রাজী হলেন না। শেষপর্যন্ত দু বছর অক্লান্ত পরিশ্রম করার পর রয়্যাল সোসাইটী তাঁর গবেষণাকে স্বীকৃতি দেয়।

জগদীশচন্দ্র গাছের বৃদ্ধির গতি মাপার জন্য ক্রেস্কোগ্রাফ যন্ত্র তৈরী করেছিলেন। এ যন্ত্রে শামুকের গতির থেকে ২০০০০ গুণ কম মাত্রায় গাছের বৃদ্ধিও ধরা পড়ত।

www.purepdfbook.com

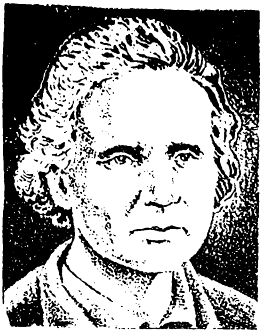

রেডিয়াম (১৯০২)

মাদাম ক্যুরী (১৮৬৭-১৯৩৪)

১৮৯৬ সালে ফরাসী বিজ্ঞানী হেনরী বেকারেল ইউরেনিয়াম যৌগের মাধ্যমে রেডিও অ্যাকটিভিটি বা তেজস্ক্রিয়তা আবিষ্কার করলে বিজ্ঞান জগতে ইউরেনিয়ামের যৌগগুলি থেকে কোনো তেজস্ক্রিয় পদার্থ আবিষ্কৃত হয় কিনা এ নিয়ে গবেষণা চলতে থাকে। ফ্রান্সে সে সময়ই গবেষণাপ্রিয় দম্পতি পিয়ের ক্যুরীও মেরী ক্যুরী গবেষণা করছিলেন এই তেজস্ক্রিয়তা নিয়ে। তাঁরা জানতেন ইউরেনিয়াম যৌগটি পাওয়া যায় পিচব্লেন্ড নামক কালো শক্ত এক ধরনের খনিজ পদার্থ থেকে। পিচব্লেন্ডের তেজস্ক্রিয়তা ছিল ইউরেনিয়ামের চেয়ে অনেক বেশী। তাঁরা অনুমান করেন পিচব্লেন্ডে হয়তো ইউরেনিয়াম ছাড়া আরো কোনো তেজস্ক্রিয় পদার্থ থাকা সম্ভব।

এই গবেষণার জন্য দরকার প্রচুর পিচব্লেণ্ড। কিন্তু পিচব্লেণ্ড কেনার পয়সা কোথায়? শেষপর্যন্ত অষ্ট্রিয়ার বোহিমিয়ার খনি থেকে সস্তায় পাওয়া গেল ইউরেনিয়াম বর্জিত পিচব্লেণ্ড। খোলা জায়গায় একটি চালাঘরকে গবেষণাগার বানিয়ে সেখানে বড় বড় পাত্রে অ্যাসিড ও জলে ঐ পিচব্লেণ্ড সেদ্ধ করা হতে লাগল। চালাঘরটা অ্যাসিড বাষ্প ও ধোঁয়ায়, গন্ধে অস্বাস্থ্যকর হয়ে উঠতে লাগল। রাতদিন সেই দম্পতি কাটিয়ে দিলেন গবেষণাগারে। আরো দরকার পিচব্লেণ্ড। কিন্তু তা কেনার টাকা নেই গরীব দম্পতির। এই সময়ই ভিয়েনার বিজ্ঞান পরিষদ টন টন পিচব্লেণ্ড পাঠাতে লাগল। আর চিন্তা রইল না।

১৮৯৮ সালে ইউরেনিয়ামের চেয়েও কিছুটা বেশী তেজস্ক্রিয় পদার্থের

www.purepdfbook.com

সন্ধান পেলেন তাঁরা। মেরী ক্যুরীর জন্মস্থান পোল্যাণ্ডের নামানুসারে পদার্থটির নামকরণ হল পোলোনিয়াম। এর তেজষ্ক্রিয়তা ইউরেনিয়ামের থেকে তিনশ গুণ বেশী।

গবেষণা থামল না। একদিন তাঁরা দেখলেন পোলোনিয়াম আলাদা করে নেবার পরও যে তরল অবশেষ পরে থাকে তার মধ্যেও তেজষ্ক্রিয়তার গুণ রয়েছে। ঐ তরল নিয়ে তাঁরা তখন গবেষণা শুরু করলেন, শেষপর্যন্ত ১৯০২ সালে পিচব্লেণ্ড থেকে ক্ষারধর্মী এক নতুন মৌলিক পদার্থ পেলেন এর তেজষ্ক্রিয়তা ইউরেনিয়ামের চেয়ে দশ লক্ষ গুণ বেশী। নাম দেওয়া হল রেডিয়াম।

১৯০৩ সালে মাদার ক্যুরীও পিয়ের ক্যুরী যুগ্মভাবে পদার্থবিদ্যায় নোবেল পুরস্কার পেলেন।

১৯১১ সালে মাদাম ক্যুরী দ্বিতীয়বার রসায়ন বিদ্যায় নোবেল পুরষ্কার পেলেন বিশুদ্ধ রেডিয়াম প্রস্তুত ও তার পারমাণবিক ওজন নির্ণয়ের জন্য। দুরোরোগ্য ক্যান্সার রোগের চিকিৎসায় রেডিয়াম খুবই কার্যকর বলে প্রমাণিত হল কিন্তু এই রেডিয়ামেরই অদৃশ্য তেজে মাদাম ক্যুরী দেহের শক্তি ক্ষয় হয়ে মারা গেলেন।

উড়োজাহাজ (১৯০৩)

উইলবার রাইট (১৮৬৭—১৯১২)

অরভিল রাইট (১৮৭১—১৯৪৮)

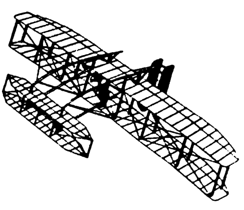

ছোটবেলায় বাবার কাছ থেকে খেলনার কাল্পনিক হেলিকপ্টার পেয়ে দুই ভাই স্বপ্ন দেখতে শুরু করেছিল তারাও আকাশে উড়ে বেড়াবে পাখীর মত।

www.purepdfbook.com

এর থেকেই শুরু।

জার্মান দেশের অটো লিলিয়েনথাল প্রথম তৈরী করলেন গ্লাইডার, এই গ্লাইডার কয়েক হাজার ফুট ওপরে উঠতে পারত এবং হাত পা নেড়ে ইচ্ছামত সেটাকে চালানো যেত। কিন্তু অটো লিলিয়েনথাল উড়োজাহাজ তৈরী করতে পারলেন না। তার আগেই ১৮৯৬ সালে এক দুর্ঘটনায় মারা গেলেন তিনি।

অটো লিলিয়েনথালের গ্লাইডারই উৎসাহিত করে তুলল দুই রাইট ভাইকে। রাইট ভাইদের ছিল একটি প্রেস আর সাইকেল মেরামতির কারখানা। গ্লাইডার কিভাবে তৈরী করা যায় সে বিষয়ে বিশেষ কিছুই জানতেন না তাঁরা। এ জন্য তাঁরা ওয়াশিংটনের স্মিথসোনিয়ান ইনস্টিটিউটে চিঠি লিখলেন, অনেক তথ্য জানলেন সেখান থেকে। তারপর বিমান বিশেষজ্ঞ অকটেভ ক্যানিউটের কাছেও গেলেন তাঁরা।

অটো লিলিয়েনথালের গ্লাইডার থেকেই তাঁরা অনুপ্রাণিত হয়ে ১৯০০ সালে তৈরী করলেন তাঁদের প্রথম গ্লাইডার। এই গ্লাইডারে ছিল একটি ডানার ওপর আরেকটি ডানা। ডানাগুলি ছিল ১৭ ফুট লম্বা। এই ডানা দুটো পাইলটের দেহের সঙ্গে এমনভাবে বাঁধা হত যাতে ইচ্ছামত দেহটাকে নাড়ালে ডানা দুটোও নাড়ানো যায় এবং এভাবে গ্লাইডারের ভারসাম্য বজায় রাখা যায়। গ্লাইডারের মুখকে উঁচু বা নীচু করার জন্য সামনের দিকে উপর নীচে দুটো ছোট পাখা লাগালেন তাঁরা। পাইলটকে সামনে বুকে ভর দিয়ে শুয়ে থাকতে হত এবং সামনের একটা লাঠিকে নাড়িয়ে গ্লাইডারের ভারসাম্য রক্ষা করা হত। কাঁধের সঙ্গে ডানার যোগ থাকায় কাঁধ নাড়লে ডানাও এদিক ওদিক নড়ত। রাডার বা হাল লাগিয়ে ডানদিক বাঁদিক চালানো যেত গ্লাইডারটাকে।

এবার তাঁরা ভাবলেন গ্যাস ইঞ্জিন লাগিয়ে বিমান ওড়াবেন। ১৯০৩ সালে তৈরী হল নতুন বিমান ফ্লায়ার। ১৭ ডিসেম্বর এই দু ডানার বিমানকে তাঁরা নিয়ে গেলেন নর্থ ক্যারোলিনার কিটি হকের মাঠে। অরভিল বিমানে উঠে শুয়ে পড়ে ধরলেন বিমানের কন্ট্রোল, ইঞ্জিন চালু করা মাত্রই ফ্লায়ার মাত্র ১২ সেকেণ্ডে মাটি থেকে ১২০ ফুট উঁচু দিয়ে উড়ে গেল। তারপর

www.purepdfbook.com

উইলবার উঠে ৫৯ সেকেণ্ডে গেল প্রায় ৮০০ ফুট।

ফ্লায়ার ১ লম্বায় ছিল ৬.৪ মিটার, ডানা ছিল ১২.২ মিটার লম্বা। ১২ অশ্বশক্তির ইঞ্জিন লাগানো হয়েছিল। গতিবেগ ছিল ঘণ্টায় ৪৮ কিমি। এর পর তৈরী হল ফ্লায়ার-২। কিন্তু সেটি উড়তে পারল না। ফ্লায়ার-১ কে একটু পাল্টে তৈরী ফ্লায়ার-৩ আবার উড়ল আকাশে। এতে একজন বৈমানিক ও একজন বিমানযাত্রী বসার মত জায়গা ছিল। খবর ছড়িয়ে পড়ল দেশ বিদেশে। মানুষের আকাশে ওড়ার স্বপ্ন সত্যি হল।

নিরাপদ কাচ (১৯০৩)

এডোয়ার্ড বেনিডিকটাস

১৯০৩ সাল। রসায়ন বিজ্ঞানী এডোয়ার্ড বেনিডিকটাস তাঁর গবেষণাগারে নানা জটিল রসায়নিক পরীক্ষার কাজে ব্যস্ত। একদিন একটি কাচের ফ্লাস্কে অ্যাসিটেন দ্রবণ ও সেলুলয়েড দ্রবণের মিশ্রণ নিয়ে পরীক্ষা করছেন। হঠাৎ তাঁর হাত ফসকে ফ্লাস্কটি পড়ে গেল মাটিতে। তিনি ভাবলেন ফ্লাস্কটি বুঝি ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে ছড়িয়ে যাবে। কিন্তু তিনি দেখে অবাক হয়ে গেলেন যে ভাঙা ফ্লাস্কটির টুকরোগুলো ভেঙে চারদিকে ছড়িয়ে না গিয়ে গায়ে গায়ে লেগে আছে। তিনি যে গবেষণায় ব্যস্ত ছিলেন তার কথা ভুলে এই নতুন রহস্য সমাধানে কৌতূহলী হয়ে উঠলেন।

তারপর তিনি বুঝতে পারলেন কাচের গায়ে সেলুলয়েডের পাতলা স্তর লেগে থাকার জন্য ভাঙা কাচের টুকরোগুলো পরস্পর গায়ে লেগেছিল।

এই ঘটনার পরই তিনি সেফটি গ্লাস তৈরী করতে মন দিলেন। তাঁর পথ ধরেই বর্তমান যুগে দুখণ্ড কাচের পর্দার মাঝে সেলুলোজ প্লাস্টিকের পাত রেখে চাপ ও তাপ দিয়ে ল্যামিনেটেড গ্লাস তৈরী হচ্ছে।

১০০ আবি-৯
www.purepdfbook.com

ইলেকট্রন টিউব (১৯০৪)

জন অ্যাম্বোজ ফ্লেমিং

শিল্প ও বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে ইলেকট্রনিক্সের ব্যবহার এখন সবচেয়ে বেশী। প্রতিটি ধাতুর তারই কতকগুলি এটমের সমষ্টি। প্রতি এটমে আছে একটি করে কেন্দ্রক। এই কেন্দ্রকের চারদিকে ইলেকট্রনরা দ্রুতগতিতে ঘুরছে। ইলেকট্রনরা অণুতে সংঘবদ্ধ থাকে। কোনো ধাতুর তারকে গরম করলে তার থেকে কিছু ইলেকট্রন বেরিয়ে যায়। এই ইলেকট্রনের নিষ্ক্রমণকে বলে থারমিওনিক এমিশন। তাই কোনো ধাতুর তারে বিদ্যুৎ প্রবাহ চালু করলে তারের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্তে ইলেকট্রন সমান গতিতে প্রবাহিত হতে থাকে। ১৮৮৩ সালে এডিসন কাচের বাল্বের মধ্যে ফিলামেণ্ট ও তার একটু দূরে একটি ধাতব পাত রেখে ইলেকট্রিক বাল্ব তৈরী করেন। এই বাল্বের ধাতুর পাতে পজিটিভ চার্জ দিতে ফিলামেন্ট ও পাতের মধ্যে বিদ্যুৎ প্রবাহ হত। বিদ্যুৎ প্রবাহিত হওয়ায় তারটি এত গরম হত যে আলো বিকিরণ করত। আর নেগেটিভ চার্জে বাল্বটির মধ্যে বিদ্যুৎ প্রবাহ বন্ধ হয়ে যেত।

এর বহু বছর ইংলণ্ডের ইঞ্জিনিয়ার জন অ্যামব্রোজ ফ্লেমিং ১৯০৪ সালে থারমিওনিক টিউব বা ইলেকট্রন টিউব তৈরী করেন। এটি ছিল একটি বায়ুশূন্য টিউব। এর মধ্যে ফিলামেন্ট ও ধাতুর পাত ছিল। এই টিউবের কাজ ছিল কোনো তরল বা বায়বীয় বা বৈদ্যুতিক প্রবাহকে ফেরার পথ বন্ধ রেখে এক মুখে চালিত করা। পজিটিভ চার্জ ধাতুর পাতে দিলে বিদ্যুৎ প্রবাহিত হত ও নেগেটিভ চার্জে তা বন্ধ হয়ে যেত। ধাতুর পাতে পজিটিভ চার্জ দিলে গরম ফিলামেন্ট থেকে বের হওয়া নেগেটিভ ইলেকট্রনগুলি ধাতুর পাত আকর্ষণ করত। কিন্তু ধাতুর পাতে নেগেটিভ চার্জ দিলে সেটি

www.purepdfbook.com

নেগেটিভ ইলেকট্রনকে আকর্ষণ করত না। তাই বিদ্যুৎপ্রবাহ বন্ধ হয়ে যেত।

১৯০৭ সালে আমেরিকার বিজ্ঞানী লী ডি ফরেষ্ট থারমিওনিক টিউবের আরো উন্নতি করেন। তিনি টিউবের ফিলামেণ্ট ও পাতের মধ্যে দুটিকে স্পর্শ না করিয়ে একটি তারের গজ বা গ্রিড রাখেন। এই গ্রিড ইলেকট্রন প্রবাহকে নিয়ন্ত্রিত করত। এর নাম দেওয়া হয় ট্রায়োড ভাল্‌ভ। কারণ এই টিউবে একটি বিশেষদিকে ইলেকট্রন প্রবাহিত হত।

ফ্লেমিং-এর টিউবটিকে বলা হত ডায়োড ভালব।

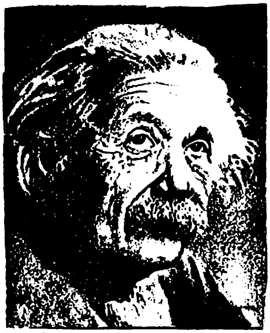

ফটোইলেকট্রিক এফেক্ট ও আপেক্ষিকতা তত্ত্ব (১৯০৫)

অ্যালবার্ট আইনস্টাইন (১৮৭৯—১৯৫৫)

ইউরোপে তখন শুরু হয়েছে নাৎসী রাজত্ব। নাৎসীরা একবার 'দ্য ব্রাউন কুক অব হিটলার টেরর' নামে একটি বইতে লেখক হিসাবে বিশ্ববিখ্যাত বিজ্ঞানী আইনস্টাইনের নাম দেখে দারুন রেগে যায় এবং তাঁর মাথার জন্য এক সহস্র পাউণ্ড পুরস্কার ঘোষণা করে। আইনস্টাইনকে একদিন সন্ধ্যাবেলায় এই ভয়ঙ্কর খবরটি দেওয়া হয়। তিনি তখন তাঁর প্রিয় বেহালায় সংগীত চর্চা করছিলেন। কথাটি শুনে তিনি অল্পক্ষণের জন্য বেহালা বাজানো থামিয়ে একটু হেসে বলে উঠলেন 'এই বইটি সম্পর্কে আমি কিছুই জানি না এবং এর লেখকও আমি নই, তবে আমার মাথার দাম যে এত বেশি তা আমি নিজে বুঝে উঠতে পারিনি।' খুবই শান্ত ও মৃদুভাবে এই কথাগুলি বলে তিনি আবার সংগীতচর্চায় ডুবে গেলেন।

এমনই শিশুর সারল্য শান্ত স্বভাব এবং সংগীতপ্রিয় মানুষ ছিলেন

www.purepdfbook.com

আইনস্টাইন।

বিশ্বখ্যাত বিজ্ঞানী ছেলেবেলায় স্কুলে যেতে চাইতেন না। কারণ স্কুলে গিয়ে পড়ার থেকেও মা-বাবা-ও কাকার কাছে পড়তে তাঁর বেশী ভাল লাগত। অ্যালবার্টের বাবা তাঁকে একবার ইউক্লিডের জ্যামিতির বই দিয়ে ছিলেন। এই বইটিই তাঁকে গণিতের প্রতি আগ্রহ জন্মাতে সাহায্য করে। বাইশ বছর বয়স থেকেই তাঁর প্রচুর মৌলিক প্রবন্ধ প্রকাশিত হতে থাকে। এই প্রবন্ধগুলি ছিল তাপ, গণিত ও আলোক বিদ্যুৎ বিষয়ক।

আইনস্টাইনের বিখ্যাত আবিষ্কার হলো ফটোইলেকট্রিক এফেক্ট ও আপেক্ষিকতা তত্ত্ব। এটি ১৯০৫ সালে প্রথম আবিষ্কৃত হয়। এমন কতকগুলি পদার্থ আছে যেমন সেলোনিয়াম—এর ওপর আলো পড়লে আলোর প্রভাবে পদার্থ থেকে ইলেকট্রন বিচ্ছুরিত হয়। এই ইলেকট্রন প্রবাহ চলতে থাকলে পদার্থটির আশেপাশে বিদ্যুৎ প্রবাহের সৃষ্টি হয়। আলোর প্রভাবে পদার্থ থেকে ইলেকট্রন বিচ্ছুরণকে বলে ফটো এমিশন। এবং ইলেকট্রন প্রবাহের ফলে বিদ্যুৎ প্রবাহের সৃষ্টিকেই বলে ফটোইলেকট্রিক এফেক্ট।

আইনস্টাইনের আপেক্ষিকতাবাদ তত্ত্ব অনুসারে দেশ ও কালের মধ্যে গতিশীল বিশ্বে সবকিছুই একে অপরের আপেক্ষিক। কেবল আলো আর আলোর গতিবেগ হল নিত্য বস্তু, অর্থাৎ যার কোনো হের ফের হয় না। আলোর গতিবেগ হল চরম গতিবেগ। বস্তুর ভর আবার গতি নির্ভর। বস্তুর গতি যত বাড়ে ভরও তত বাড়ে। গতি যখন আলোর গতিতে পৌছায় তখন ভর হয় অসীম।

আইনস্টাইন বলেছিলেন পদার্থ আর শক্তি হল এক। একটির আরেকটিতে রূপান্তরিত হওয়া সম্ভব। তিনি এই শক্তির নাম দেন E, ভর হল M এবং C হল শূন্যে বা বায়ুমণ্ডলে আলোর গতিবেগ। তিনি একটি সূত্র বের করে বিজ্ঞানীদের ধারণা বদলেদেন। সূত্রটি হল $E=mc^2$ অর্থাৎ কোনো ভরের মধ্যে লুকিয়ে থাকে অদৃশ্য শক্তি। ভরকে শক্তিতে এবং শক্তিকে ভরে রূপান্তরিত করে তিনি এক বিপুল পারমাণবিক শক্তির উদ্ভবের কথা বলেন। ১৯২১ সালে তিনি পদার্থবিদ্যায় নোবেল পুরস্কার পান।

www.purepdfbook.com

বেকেলাইট (১৯০৭)

লিও বেকেল্যাণ্ড

ঊনবিংশ শতাব্দীর একেবারে প্রথম দিকে ১৯০৭ সালে বেলজিয়ামের রসায়ন বিজ্ঞানী ডঃ লিও বেকেল্যাণ্ড ফেনল নামক অ্যান্টিসেপটিক বৈশিষ্ট্য যুক্ত এক সাধারণ জৈব যৌগ এবং উদ্ভিদের সালোকসংশ্লেষের সময় তৈরী হওয়া তীব্র ঝাঁঝালো গন্ধযুক্ত ফরম্যালডিহাইডের রাসায়নিক বিক্রিয়ায় বেকেলাইট নামক এক নতুন যৌগিক পদার্থ তৈরী করেন। তিনিই সর্বপ্রথম আবিষ্কার করেন ফেনোল ও ফরম্যালডিহাইডের ক্রিয়া নিয়ন্ত্রণ করে ব্যবহারোপযোগী ফোনোলিক প্লাস্টিক তৈরী করা যায়। বেকেলাইট দিয়ে চশমার ফ্রেম, চিরুনি, কলমের হাতল তৈরী হয়।

টাইটেনিয়াম (১৯১০)

হান্টার

১৭৮৯ সালে এক ইংরেজ যাজক উইলিয়াম গ্রেসর খনিজ পদার্থের রাসায়নিক গবেষণা করে একটি মৌলের সন্ধান পান। খনিজ পদার্থটি তাঁর কর্মস্থান মেনাচান উপত্যকা থেকে পাওয়া গেছিল বলে এই নতুন মৌলের নাম তিনি রাখেন মেনাচিন। এরপর ১৭৯৫ সালে জার্মান বৈজ্ঞানিক ক্লাগরথ রুটাইল নামক এক খনিজের মধ্যে অনুরূপ মৌলটি পাওয়া যাবে বলে প্রমাণ দেন। এই মৌলের আশ্চর্য ক্ষমতার জন্য তিনি গ্রীক পুরাণের বর্ণিত দৈত্য টাইটানের নামানুসারে ধাতুটির নামকরণ করেন টাইটেনিয়াম।

কিন্তু টাইটেনিয়াম ধাতু আবিষ্কার করা তাঁদের পক্ষে সম্ভব হয়নি। এরপর ১৯১০ সালে মিস্টার হান্টার সোডিয়াম ধাতুর সঙ্গে টাইটেনিয়াম টেট্রাক্লোরাইডের মিশ্রণ করিয়ে এই মিশ্রণকে একটি বন্ধ পাত্রে রেখে গরম

www.purepdfbook.com

করতে থাকেন। ফলে সোডিয়াম ধাতু সোডিয়াম ক্লোরাইড বা নুনে পরিণত হয় এবং টাইটেনিয়াম ধাতু আলাদা হয়ে যায়।

এরও ত্রিশ বছর পর ১৯৪০ সালে জার্মান বিজ্ঞানী ক্রোল আমেরিকায় টাইটেনিয়াম ধাতু প্রস্তুত করার নতুন পদ্ধতি আবিষ্কার করে পেটেন্ট নেন। তাঁর পদ্ধতিতে ইস্পাতের বদ্ধ পাত্রের মধ্যে গলিত ম্যাগনেসিয়াম ধাতুর সঙ্গে টাইটেনিয়াম ক্লোরাইড মিশিয়ে গরম করলে ম্যাগনেসিয়াম ক্লোরাইড ও টাইটেনিয়াম ধাতু পাওয়া যায়। পাত্রের মধ্যে আর্গন বা হিলিয়াম গ্যাস প্রবেশ করিয়ে এই ধাতুকে অক্সিজেন ও নাইট্রোজেনের সংযোগ থেকে রক্ষা করা হয়। কারণ বেশী উত্তপ্ত হলে এ ধাতু সহজে অক্সিজেন, নাইট্রোজেন প্রভৃতির সাথে যুক্ত হয় চক্‌চকে এক ধরণের যৌগিক পদার্থ উৎপন্ন করে।

ইস্পাতের গরম পাত্রটি ঠাণ্ডা করে ভেতরের উৎপন্ন বস্তুকে অ্যাসিডে গলালে ম্যাগনেশিয়াম ক্লোরাইড ও অতিরিক্ত ম্যাগনেসিয়াম ধাতু মিশ্রিত হয়ে যায় এবং টাইটেনিয়াম স্পঞ্জ পড়ে থাকে। এই স্পঞ্জকে আর্গন বা হিলিয়াম গ্যাসে পূর্ণ পাত্রে গরম করলে শক্ত টাইটেনিয়াম ধাতু পাওয়া যায়।

এই ধাতু ইস্পাতের মত শক্ত অথচ খুবই হালকা। এর গলনাঙ্ক ১৭০০ ডিগ্রী।

তাপীয় আয়নন তত্ত্ব (১৯১৯)

মেঘনাদ সাহা (১৮৯৩-১৯৫৬)

১৯০৫ সাল। ভারতে তখন বঙ্গভঙ্গের প্রতিবাদে শুরু হয়েছে স্বদেশী আন্দোলন। ঢাকার শেওড়াতলী গ্রামের এক গরীব দোকানদারের ছেলে খাদির পোশাকে আর খালি পায়ে স্কুলে আসতে শুরু করল। বাংলাদেশের

www.purepdfbook.com

তখনকার ছোটলাট ফুলার আসছেন স্কুল পরিদর্শনে। স্কুল কর্তৃপক্ষ সকল ছাত্রকে জানালো ছোটলাটকে অভিনন্দন জানাবার জন্য সকলকে স্কুলে হাজির থাকতে হবে। কিন্তু ছেলেটি আর তার কয়েকজন বন্ধু সেদিন স্কুলেই এল না। আদেশ অমান্য করায় স্কুল থেকে নাম কাটা পড়ল ছেলেটির ও তার বন্ধুদের। ফলে বৃত্তি ও বিনা বেতনে পড়ার সুযোগ হারাল ছেলেটি। এই মাথা উঁচু করে রাখা ছেলেটিই পরবর্তীকালে হয়েছিলেন মহান বিজ্ঞানী ডঃ মেঘনাদ সাহা।

ঢাকা থেকে আই সি এস পাশ করে কলকাতার প্রেসিডেন্সী কলেজে থেকে ১৯১৩ সালে গণিতে অনার্স সহ প্রথম শ্রেণীতে দ্বিতীয় স্থান নিয়ে উত্তীর্ণ হন মেঘনাদ সাহা। ১৯১৫ সালে ফলিত গণিত শাস্ত্রে প্রথম শ্রেণীতে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে এম এস সি পাশ করেন।

অর্থ উপার্জনের জন্য ভারতীয় ফাইনান্স সার্ভিসে যোগ দেবার কথা ভেবেছিলেন। কিন্তু স্বদেশী এবং রাজনৈতিক নেতাদের সাথে যোগাযোগ থাকার জন্য তিনি তৎকালীন সরকারী কাজে যোগদানের অধিকার থেকে বঞ্চিত হন। স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় তাঁর প্রতিষ্ঠিত নতুন বিজ্ঞান কলেজে ১৯১৭ সালে অধ্যাপনার সুযোগ দেন। অধ্যাপক মেঘনাদ সাহা তাপগতি বিদ্যা, আপেক্ষিকতা, পরমাণুতত্ত্ব প্রভৃতি পদার্থবিদ্যার আধুনিক দিকগুলো নিয়ে নিজে পড়তেন ও ছাত্রদের পড়াতেন। এসময় একদিন নভোবস্তু বিদ্যা সংক্রান্ত বিষয় পড়াতে গিয়ে তিনি একটি সমস্যার সামনে পড়েন। নক্ষত্রের উষ্ণতা, আভ্যন্তরীন গঠন ও তাদের প্রকৃতি এগুলিই ছিল নভোবস্তু বিদ্যার অন্তর্গত। এই সমস্যার সমাধানের জন্য তিনি ১৯১৯ সালে তাপীয় আয়ননতত্ত্ব আবিষ্কার করেন।

জলবিন্দুর মধ্যে সূর্যের আলো পড়লে বর্ণালী দেখা যায়। তেমনি প্রিজমের মধ্য দিয়ে সূর্যের আলো গেলেও বর্ণালীর সৃষ্টি হয়। বর্ণালীর রঙের ছটার মধ্যে উজ্জ্বল ও অন্ধকার, সরু এবং চওড়া বিভিন্ন বর্ণালী সংক্রান্তরেখা বা ফ্রন হোপার রেখা দেখা যায়। বিজ্ঞানী গুস্তভ্ রবার্ট কিরচফ প্রথম দেখিয়ে ছিলেন যে এই ফ্রন হোপার রেখা বা বর্ণালী সংক্রান্ত রেখার সাহায্যে সূর্যের মৌলিক বস্তুগত গঠন বোঝা যায়। বর্ণালী বিশ্লেষণ করে তাঁরা সীজিয়াম ও রুবিডিয়াম নামক দুটি মৌলিক পদার্থের সন্ধান পেয়েছিলেন। কিন্তু

www.purepdfbook.com

জ্যোর্তিবিজ্ঞানীরা তখনও পর্যন্ত এই বর্ণালী সংক্রান্ত রেখা সৃষ্টির কারণ ব্যাখ্যা করতে পারেননি। মেঘনাদ সাহা তাঁর তাপীয় আয়নন সূত্রের সাহায্যে তার ব্যাখ্যা করেন।

তাপ প্রয়োগে আয়নন প্রক্রিয়াকে বলে তাপীয় আয়নন। এই সূত্রের সাহায্যে বিভিন্ন উষ্ণতায় ও চাপে বিভিন্ন পদার্থের আয়নন মাত্রাও তিনি গণনা করেন। এই সূত্রের প্রথম প্রয়োগ হয় জ্যোর্তিবিজ্ঞানে। জানা যায় যে সৌরমণ্ডলে রুবিডিয়াম, সীজিয়াম প্রভৃতি মৌলিক পদার্থগুলি আয়নিত অবস্থায় থাকে। সৌর কলঙ্কের উষ্ণতা সূর্যের উষ্ণতার থেকে কম। তাই সৌর কলঙ্কের বর্ণালী একটু আলাদা হয়। বিভিন্ন নক্ষত্রের আলোর বর্ণালী বিশ্লেষণ করে ঐ সব নক্ষত্রের পৃষ্ঠ তাপমাত্রাও তিনি নির্ণয় করেন।

বর্ণালী বিশ্লেষণ যন্ত্রের সাহায্যে সূর্যের বর্ণালী বিশ্লেষণ করে তিনি প্রমাণ করেন পার্থিব সব মৌলিক পদার্থগুলিই সূর্যদেহে রয়েছে। তিনি হিসাব দেন সূর্য দেহের ১০০ ভাগের মধ্যে হাইড্রোজেন আছে ৮১.৭ ভাগ, হিলিয়াম ১৮.১৭ ভাগ, কার্বন .০৭ ভাগ। নাইট্রোজেন, অক্সিজেন, লোহা, দস্তা, টিন, নিকেল, সোডিয়াম, ক্যালসিয়াম, সিলিকন, ম্যাগনেসিয়াম, সীসা প্রভৃতি পার্থিব বস্তুর পরিমাণ .০৬ ভাগের মতো। ফলে পৃথিবীর জন্ম রহস্যের সমাধান হয়। তিনি পৃথিবীর প্রথম শ্রেণীর বিজ্ঞানীরূপে সম্মানিত হন।

১৯৪৮ সালে ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব সায়েন্স নামক সংস্থার প্রতিষ্ঠা করেছিলেন মেঘনাদ সাহা। দামোদর উপত্যকা, ভাক্‌রা নাঙ্গাল ও হীরাকুঁদ পরিকল্পনা তাঁরই গবেষণার ফল। তিনি সায়েন্স ও কালচার নামে একটি পত্রিকাও প্রকাশ করেন। জীবনের শেষ কয়েকবছর তিনি আয়নযুক্ত উর্দ্ধবায়ু মন্ডল দিয়ে রেডিও তরঙ্গের গমনাগমন বিষয়ে গবেষণা করেছিলেন।

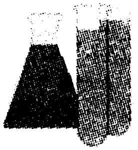

www.purepdfbook.com

কালাজ্বর (১৯২২)

উপেন্দ্রনাথ ব্রহ্মচারী

ভারতবর্ষ ও নিরক্ষীয় অঞ্চলগুলিতে এক বিশেষ ধরণের রোগ দেখা যেত, এই রোগে প্রথম দিকে অল্প অল্প জ্বর আসতো। তারপর প্লীহা ও যকৃৎ অস্বাভাবিক বেড়ে উঠত। তারপরই রক্তাল্পতা, মাথার চুল ওঠা, শরীর শুকিয়ে যাওয়া আর দেহের নানান স্থান থেকে রক্তক্ষরণ হত। শেষে মারা যেত রোগী। এই রোগের নাম কালাজ্বর। কালাজ্বর একবার শুরু হলে মহামারীর আকার নিত। অথচ তখনও এ রোগের কোনো প্রতিষেধক পাওয়া যায়নি।

১৮৫৯ সাল। কালাজ্বরের কবলে বর্ধমান জেলার শতকরা আশি জন লোকই মারা গেল। কিন্তু কি কারণে ঐ রোগ সংক্রামিত হচ্ছে চিকিৎসকরা কিছুতেই বুঝে উঠতে পারলেন না।

১৯০০ সালে ইংরাজ বিজ্ঞানী লিশম্যান কালাজ্বরে মৃতরোগীর প্লীহা নিয়ে পরীক্ষা করতে গিয়ে একদিন হঠাৎ প্লীহার মধ্যে লুকিয়ে থাকা এক পরজীবী জীবাণুর সন্ধান পেলেন। আরো কয়েকটি মৃতরোগীর প্লীহা নিয়ে পরীক্ষা করে একই ফল পেলেন। তিনি ঐ জীবাণুর নাম দিলেন এল. ডি. বডি। বুঝলেন ঐ জীবাণু থেকেই রোগ সংক্রামিত হচ্ছে।

১৯০৪ সালে রজার্স নামক এক জীবাণুতত্ত্ববিদ গবেষণা করে দেখলেন Sand fly (স্যাণ্ড ফ্লাই) নামের এক ধরণের মাছির মাধ্যমে সুস্থ দেহে এল. ডি. বডি পরজীবী জীবাণু প্রবেশ করে। কিন্তু লিশম্যান ও রজার্স উভয়েই রসায়ন বিজ্ঞানী না হওয়ায় এই রোগের প্রতিষেধক বের করতে পারলেন না।

www.purepdfbook.com

কলকাতার ক্যাম্বেল মেডিকেল হাসপাতালে তখন অধ্যাপনা ও গবেষণা করতেন চিকিৎসাবিজ্ঞানী উপেন্দ্রনাথ ব্রহ্মচারী। তিনি রসায়নবিদ্‌ও ছিলেন। তাঁর প্রথমদিকে গবেষণা ছিল ম্যালেরিয়া ও তার প্রতিষেধক। রোনাল্ড রস ম্যালেরিয়া আবিষ্কার করার পর ঐ বিষয় থেকে সরে এসে তিনি লিশম্যান ও রজার্সের গবেষণার ওপর ভিত্তি করে কালাজ্বরের প্রতিষেধক নিয়ে গবেষণা করতে থাকেন।

তখনকার দিনে কালাজ্বর হলে টারটার এমিটিক নামের এক ওষুধ দেওয়া হত। কিন্তু তাতে কোনো ফল হত না। উপেন্দ্রনাথ তখন সোডিয়াম অ্যান্টিমনি টারটেট নামক এক ওষুধ দিতে লাগলেন। কিন্তু এ ওষুধ তৈরী করাতে অসুবিধা ছিল। তখন তিনি নানারকম ষ্টিবামিন অ্যাসিড তৈরী করে রোগীর দেহে প্রবেশ করালেন। কিন্তু বিশেষ কোনো ফল পাওয়া গেল না। শেষ পর্যন্ত ১৯২২ সালে ইউরিয়া দিয়ে স্টিবামিন অ্যাসিড তৈরী করে ভাল ফল পেলেন। আবিষ্কৃত হল কালাজ্বরের প্রতিষেধক ইউরিয়া স্টিবামিন।

বোস পরিসংখ্যান পদ্ধতি (১৯২৪)

সত্যেন্দ্রনাথ বসু (১৮৯৪—১৯৭৪)

এন্ট্রান্স পরীক্ষার জন্য যে টেস্ট পরীক্ষা নেওয়া হত সেই পরীক্ষায় হিন্দু স্কুলের ছাত্র সত্যেন্দ্রনাথ বসু অঙ্কে ১০০ নম্বরের মধ্যে পেয়েছিলেন ১১০। পরীক্ষায় মোট দেওয়া হয়েছিল ১১টি প্রশ্ন। তার মধ্যে ১০টি প্রশ্নের উত্তর দিতে বলা হয়েছিল ছাত্রদের। কিশোর সত্যেন্দ্রনাথ ১১টি প্রশ্নে উত্তর দিয়ে আবার জ্যামিতির অতিরিক্ত সমস্যাগুলিও তিনরকম পদ্ধতিতে সমাধান করে দেখিয়েছিলেন। এরকমই গণিতের প্রতি ভালবাসা ছিল সত্যেন্দ্রনাথের। শুধু গণিতই নয় ছাত্রাবস্থাতেই ভারতীয় সাহিত্য, সংস্কৃত সাহিত্য চর্চা এবং ফরাসী

www.purepdfbook.com

ভাষা শিখে নিয়েছিলেন। আই, এস সি, অনার্স সহ বি, এস, সি ও এম, এস, সি কোনো পরীক্ষাতেই প্রথম ছাড়া দ্বিতীয় হননি তিনি। কোনো গাণিতিক সমস্যার মুখোমুখি পড়লে মূল নিয়ম থেকে শুরু করে শেষ পর্যন্ত সমাধান করার যে প্রবণতা কিশোর সত্যেন্দ্রনাথের মধ্যে দেখা গিয়েছিল সেই প্রবণতাকেই তিনি কাজে লাগিয়েছিলেন তাঁর জীবনের শ্রেষ্ঠ আবিষ্কারের ক্ষেত্রে।

বিংশ শতাব্দীর শুরুতেই ম্যাক্স প্ল্যাঙ্ক তাঁর কোয়ান্টাম থিয়োরী ও আইনস্টাইন আপেক্ষিকতাবাদ প্রচার করে পদার্থবিদ্যাকে এক নতুন যুগে পৌঁছে দেন। সত্যেন্দ্রনাথ প্রধানতঃ গণিতের ছাত্র হয়েও মেঘনাদ সাহা, জ্ঞান ঘোষ প্রমুখ বন্ধুদের সাহচর্যে, পদার্থবিদ্যা ও রসায়নে আগ্রহী হন। আশুতোষ মুখোপাধ্যায় প্রতিষ্ঠিত বিজ্ঞান কলেজে অধ্যাপনা করার সময় বহু কষ্টে সত্যেন্দ্রনাথ ও মেঘনাদ আধুনিক পদার্থবিদ্যা সংক্রান্ত বই যোগাড় করে পড়তেন ও ছাত্রদেরও শিক্ষা দিতেন। শুধু আধুনিক বিজ্ঞান নিয়ে চর্চা করার উদ্দেশ্যেই তাঁরা জার্মান ভাষাও শিখে নেন। এই সময়ই তাঁরা ১৯২০ সালে বিজ্ঞানী প্রশান্ত মহলানবীশের সহযোগিতায় আইনস্টাইনের আপেক্ষিকতাবাদ সম্পর্কিত কতগুলি নিবন্ধ জার্মান ভাষা থেকে ইংরাজীতে অনুবাদ করেন।

১৯২১ সালে সত্যেন্দ্রনাথ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থবিদ্যার রীডারের পদে নিযুক্ত হন। এসময় তাঁর এক বন্ধু বিদেশ থেকে তাঁকে ম্যাক্স প্ল্যাঙ্কের 'Thermodynamics and Heat' বইটি উপহার দেন। বইটি ছিল বিখ্যাত পদার্থবিদদের সমস্ত গবেণামূলক প্রবন্ধ সংকলন। বইটি হাতে পেয়েই সত্যেন্দ্রনাথ বইয়ের সমস্ত সমীকরণ ও সূত্রগুলির সমাধান করে ফেললেন। প্ল্যাঙ্ক একটি সমীকরণের সমাধান করতে গিয়ে আনুমানিক প্রকল্প গ্রহন করেন এবং সমীকরণের আসন্ন সমাধান করেন, কিন্তু সত্যেন্দ্রনাথের স্বভাব ছিল শেষপর্যন্ত দেখা, ফলে তিনি উন্নত উপায়ে সমীকরণটির সমাধানের চেষ্টা করতে লাগলেন। ১৯২৪ সালে মাত্র ত্রিশ বছর বয়সে প্ল্যাঙ্কের সূত্র আলোক কোয়ান্টাম তত্ত্ব (Planck's law and light Quantum hypothisis) নামে একটি চার পাতার গবেষণামূলক পুস্তিকা বের করেন।

একটি ভারতীয় ও কয়েকটি বিদেশী পত্রিকায় এই পুস্তিকাটি প্রকাশের জন্য সত্যেন্দ্রনাথ পাঠান। কিন্তু তারা কেউই উৎসাহ দেখালেন না। তখন ঐ

www.purepdfbook.com

বছরই সত্যেন্দ্রনাথ লেখাটি বিজ্ঞানী আইনস্টাইনের কাছে মতামতের জন্য পাঠান। আইনস্টাইন নিবন্ধটি পড়ে মুগ্ধ হন এবং তার গুরুত্ব বুঝে নিজেই জার্মান ভাষায় অনুবাদ করে জার্মানীর বিশিষ্ট পত্রিকা 'সাইটস্ শ্রিফ্‌ট ফ্যুরফিজিক' পত্রিকায় প্রকাশের ব্যবস্থা করেন। অনুবাদের শেষে অনুবাদকের মন্তব্যে লিখেছিলেন, আমার মতে বোস কর্তৃক প্ল্যাঙ্কের এই সূত্র নির্ধারণ পদ্ধতি একটি অতীব গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ।

সত্যেন্দ্রনাথের এই গবেষণার ফলেই তেজষ্ক্রিয়তার ধর্ম ব্যাখ্যা করার জন্য যে পরিসংখ্যান পদ্ধতি আবিষ্কৃত হয় তাকে বলে বসু সংখ্যায়ন। ফোটন আলফা কণা, ডয়টেরন প্রভৃতি মৌলিক কণাগুলি বসু-সংখ্যায়ন মেনে চলে বলে এগুলিকে 'বোসন' বলা হয়।

পদার্থের কণাগুলির সমষ্টিগত ধর্ম তাদের নিজের নিজের ধর্মের চেয়ে আলাদা, তাই কণাদের আচরণ স্পষ্টভাবে জানতে গেলে তাদের পৃথক ধর্মের ওপর জোর না দিয়ে সমষ্টিগত ধর্মের ওপর গুরুত্ব দিতে হবে। এই ঘটনাকেই বলে কোয়ান্টাম সংখ্যাতত্ত্ব। এটি বোস সংখ্যায়ন তত্ত্বের ওপর ভিত্তি করেই গড়ে উঠেছে। আইনস্টাইন একক পরমাণুর গ্যাসের ক্ষেত্রে বোস-সংখ্যায়ন প্রয়োগ করে এই সংখ্যাতত্ত্বের পরিবর্ধন করায় পরবর্তীকালে নতুন গণনা পদ্ধতিটির নাম হয় বোস-আইনস্টাইন সংখ্যায়ন।

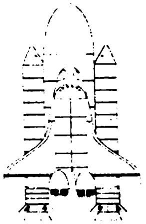

রকেট (১৯২৬)
রবার্ট হাচিন্স গডার্ড

রকেট আবিষ্কার কোনো নতুন ঘটনা নয়। চীন দেশের মানুষ প্রথম এই রকেট বা হাউইকে ব্যবহার করেছিল মোঙ্গলদের সঙ্গে যুদ্ধ করার সময়।

আতস বাজী হিসাবেও রকেটের ব্যবহার শুরু হয়েছিল দীর্ঘকাল ধরেই, এই হাউই বাজী হল পাঁচ-ছয় ইঞ্চি লম্বা একটা পিচবোর্ড বা বাঁশের সরু খোল। খোলের মধ্যে বারুদ পোরা থাকে। এই খোলের ভারসাম্য রাখার

www.purepdfbook.com

জন্য একটি লম্বা কাঠি লাগানো থাকে। বাজীর সলতেয় আগুন ধরিয়ে দিলেই বারুদ পুড়তে শুরু করে এবং খোলের পিছন দিক দিয়ে গ্যাস বের হতে থাকে। এই গ্যাস সামনের দিকে ঠেলা মারে। ফলে লম্বা খোলটা অনেক ওপরে উঠে যায়। বারুদটা পুড়ে শেষ হয়ে গেলে খোলের আর গতি থাকে না তাই মাধ্যাকর্ষণ শক্তির জন্য মাটির দিকে নেমে আসে।

রকেটও পৃথিবী ছেড়ে ওপরে ওঠে এই হাউই বাজীর পদ্ধতিতেই। তবে এখানে শুকনো জ্বালানী বারুদ ব্যবহার করা হয় না, কারণ তাতে যথেষ্ট ধাক্কা দিয়ে রকেটকে ওপরে তুলে দেওয়ার ক্ষমতা থাকে না। তাই ব্যবহৃত হয় তরল অক্সিজেন ও পেট্রোল। দুটো আলাদা আলাদা ট্যাঙ্কে এই পদার্থগুলি রাখা হয়। ট্যাঙ্ক থেকে কন্ট্রোল ভাল্‌বের সাহায্যে আনা হয় জ্বালানী ঘরে। সেখানে পদার্থগুলি মিশে জ্বলে উঠে। পরিত্যক্ত গরম গ্যাস জ্বালানী ঘর থেকে দ্রুতগতিতে পিছন দিক দিয়ে বেরিয়ে যায় ফলে রকেট সামনের দিকে খুব জোরে এগিয়ে যায়।

রেট্রো রকেট অর্থাৎ যে রকেটে মহাকাশযানের গতিবেগ কমে আসে সেই রকেটে শুকনো জ্বালানী ব্যবহৃত হয়। রেট্রো রকেট থাকলে মহাকাশ যান খুব সহজে মাটিতে নামতে পারে।

রকেটে তরল জ্বালানী ব্যবহার করা ও তাকে মহাকাশে পাঠাবার উপায় প্রথম আবিষ্কার করেছিলেন ১৯২৬ সালে রবার্ট হাচিন্স গডার্ড। তাঁর গবেষণা সম্বন্ধে একটি মজার ঘটনা আছে। তাঁর ল্যাবরেটরিটি ছিল একটি স্কুল বাড়ীর মাটির তলায়। সেখানে কাজ করতে গিয়ে একদিন তিনি সমস্ত স্কুলটাকে ধোঁয়ার ঢেকে দিয়েছিলেন। ফলে একজন বড় গণিতজ্ঞ ও বিজ্ঞানী হয়েও তাঁকে স্কুল কর্তপক্ষের কাছে বকুনি খেতে হয়েছিল।

রকেটকে মহাকাশে পাঠাতে গেলে তাকে পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ শক্তিকে কাটিয়ে উঠতে হয়, এজন্য রকেটের গতিবেগ ঘন্টা ২৫০০০ মাইলের বেশি হতে হয়। এই গতিবেগকে বলে এসকেপ ভেলোসিটি।

রকেট যদি সোজা না গিয়ে ঘুরে গিয়ে ঘন্টায় ১৫০০০ মাইল থেকে ২৫,০০০ মাইল গতিবেগের মধ্যে থাকে তবে সেটা ডিম্বাকারে ক্রমাগতই পৃথিবীর চারদিকে ঘুরতে থাকবে, কৃত্রিম উপগ্রহগুলি এভাবেই ঘোরে।

এসকেপ ভেলোসিটি পাওয়ার মত ক্ষমতা কেবলমাত্র একটি রকেটের

www.purepdfbook.com

পক্ষে সম্ভব নয়। এজন্য বিজ্ঞানীরা বড় আকারের একটি রকেট তৈরী করার কথা ভাবলেন, যেটি পর পর আরো দুটি ছোট রকেট বহন করঁতে পারে। বড় রকেটটি এমনভাবে তৈরী করা হল যাতে সেটি চল্লিশ মাইল ওপরে উঠে ঘন্টায় চার হাজার মাইল বেগে ছুটতে পারে। প্রথম রকেটের জ্বালানি ফুরিয়ে গেলে আগুন লাগে দ্বিতীয় রকেটের জ্বালানিতে। এবং প্রথম রকেটের থেকে নির্গত গ্যাসই সামনের দিকে ঠেলে দেয় দ্বিতীয় রকেটটিকে। এভাবে দ্বিতীয় রকেটও কিছুদূর গিয়ে তৃতীয় রকেটকে এগিয়ে দেয়।

পেনিসিলিন (১৯২৮)

স্যার আলেকজাণ্ডার ফ্লেমিং (১৮৮১—১৯৫৫)

১৯২৮ সালে লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের জীবাণু বিদ্যার অধ্যাপক আলেকজাণ্ডার ফ্লেমিং স্ট্যাফাইলোকক্কাস নামে বিভিন্ন রোগ উৎপাদনকারী এক ধরণের জীবাণু নিয়ে গবেষণা করছিলেন।

কিভাবে ঐ জীবাণুকে দুর্বল করে দেওয়া যায় তার উপায় বের করতে তিনি পেট্রিডিশে (কাচের তৈরী চওড়া, অগভীর, গোলাকার এক ধরণের বাটি, এর ওপরে কাচের ঢাকনা থাকে) জীবাণুটিকে রেখে তাতে অ্যাগার নামের এক ধরণের সামুদ্রিক শ্যাওলাজাত আঠালো পদার্থ দিয়ে ঐ জীবাণুর বংশবৃদ্ধি ঘটিয়ে তাদের বৈশিষ্ট্য পরীক্ষা করে দেখছিলেন।

গবেষণার সময় ফ্লেমিং-এর অজান্তে এক ধরণের ছত্রাক বাতাসের মাধ্যমে এসে পড়ে এই পেট্রিডিশে। হঠাৎ তিনি একদিন লক্ষ্য করেন পেট্রিডিশের মধ্যে সবুজ রঙের এক ধরণের ছত্রাক জন্মেছে, কদিন পর তিনি দেখেন এই ছত্রাকের পরিমাণ অনেক বেড়ে গেছে এবং ছত্রাকের চারপাশে স্ট্যাফাইলোকক্কাস জীবাণুগুলি আর নেই। তিনি ব্যাপারটিকে সাধারণ বলে

www.purepdfbook.com

মনে করলেন না।

গবেষণা করে তিনি বুঝতে পারলেন যে এই জাতীয় ছত্রাকের বীজ বাতাসে উড়ে বেড়ায়। বাতাসের মাধ্যমেই ঐ ছত্রাক এসে পড়েছে পেট্রিডিশে এবং সেখানে অ্যাগারের প্রভাবে ছত্রাকটির দেহকোষ বৃদ্ধির সময় ঈষৎ হলুদ রঙের এক প্রকার জৈব রাসায়নিক পদার্থ বের হয়। সেটির প্রভাবেই স্ট্যাফাইলোকক্কাস জীবাণু ধ্বংস হয়েছে।

তিনি ঐ পদার্থের জীবদেহে প্রতিক্রিয়া কি তা জানবার জন্য খরগোশের দেহে প্রবেশ করালেন। কিন্তু কোনো বিরূপ প্রতিক্রিয়া হল না। নিজ দেহের রক্ত কাচের স্লাইডে রেখে তাতে প্রয়োগ করেও কোনো বিরূপ প্রতিক্রিয়া পেলেন না। ছত্রাকটির নাম তিনি দিলেন পেনিসিলিয়াম নোটেটাম এবং ছত্রাকের দেহ নিঃসৃত জীবাণু প্রতিরোধক পদার্থটির নাম দিলেন পেনিসিলিন।

মানুষের শরীরে পেনিসিলিন প্রয়োগ করতে গেলে পেনিসিলিনকে নিষ্কাশন করতে হয়। ফ্লেমিং পেনিসিলিন নিষ্কাশন করতে পারেননি। এ ব্যাপারে সফল হয়েছিলেন ডঃ আর্নেস্ট বোরিস বেচইন এবং ডঃ হাওয়ার্ড ফ্লোরি। ১৯৪৫ সালে ফ্লেমিং পেনিসিলিন আবিষ্কারের জন্য নোবেল পুরস্কার পেয়েছিলেন।

রামন এফেক্ট (১৯২৮)

চন্দ্রশেখর ভেঙ্কটরামন্ (১৮৮৮—১৯৭০)

চন্দ্রশেখর ভেঙ্কটরামনের জন্ম দক্ষিণ ভারতের ত্রিচিনোপল্লীতে। মাত্র আঠারো বছর বয়সে পদার্থবিদ্যায় প্রথম স্থান পেয়ে এম, এ পাশ করে তিনি। সিভিল সার্ভিস পরীক্ষা দিয়ে ভারতীয় ফিনান্স ডিপার্টমেন্টের ডেপুটি

www.purepdfbook.com

অ্যাকাউন্টেন্ট জেনারেল হন। ১৯০৮ সালেই ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন ফর কালটিভেশন অফ সায়েন্সের সদস্য হন। এ সময়ই তাঁর সাথে পরিচয় হয় ঐ সংস্থার সম্পাদক স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের এবং তারপর থেকে তিনি শব্দ বিজ্ঞান, বাদ্যযন্ত্রের শব্দ তত্ত্ব ও আলোর তরঙ্গ ধর্মের ওপর গবেষণা করতে থাকেন। তাঁর মৌলিক গবেষণা সংক্রান্ত প্রবন্ধগুলি নেচার, ফিলসফিক্যাল ম্যাগাজিন, ফিলজফিক্যাল রিভিউ পত্রিকায় প্রকাশ পেতে থাকে।

১৯১৯ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য আশুতোষ মুখোপাধ্যায় রামনকে বিজ্ঞান কলেজের পদার্থবিদ্যার পালিত অধ্যাপক পদ নেবার আহ্বান জানান। কলকাতায় এসেই রামন প্রথম পদার্থের অণুসমূহ কর্তৃক আলোক বিচ্ছুরণ তত্ত্বের ওপর আকর্ষণ বোধ করেন।

১৯২১ সালে তিনি ইউরোপ যান। ইউরোপ থেকে ফেরার পথে জাহাজের ডেকে বসে নীল আকাশ ও নীল সমুদ্র দেখতে দেখতে তাঁর মনে প্রশ্ন জাগে আকাশ ও সমুদ্র নীল কেন? এ সম্পর্কে বিজ্ঞানী লর্ড র্যালের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যাকে তিনি পরীক্ষার মাধ্যমে প্রমাণ করেন।

কোনো বস্তুতে আলোক রশ্মি পড়লে সেই বস্তুটি যে রঙের সেই রঙটিকেই কেবল বিকিরিত করে, বাকি সব রঙ শোষণ করে নেয়, তাই বস্তুটি যে রঙের হয় তাকে আমরা ঠিক সেই রঙেই দেখি।

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ দিকে আলোকের শোষণ ও বিকিরণ সম্বন্ধে লর্ড র্যালের ব্যাখ্যাটি ছিল গুরুত্বপূর্ণ। কোনো বস্তুর অণুতে আলো কিভাবে বিকিরিত হয় সেই নিয়েই দীর্ঘদিন ধরে লর্ড র্যালে গবেষণা করেছিলেন। গবেষণার পর তিনি জানান নির্দিষ্ট কম্পন সংখ্যার আলোক তরঙ্গের সঙ্গে যদি অণুর সংঘাত ঘটে তাহলে আলোর দীপ্তি কমে যাবে। কিন্তু কম্পন সংখ্যা আপতিত আলোর সমান থাকবে। আলোক বিকিরণের সময় কম্পন সংখ্যার যদি কমা-বাড়া হয়, তাহলে যে আলো বিক্ষিপ্ত হবে তার দীপ্তি খুবই কম হবে।

ভারতীয় বিজ্ঞানী রামন আলোকের এই ধর্মের প্রতি আকর্ষণ বোধ করে র্যালের ব্যাখ্যা পরীক্ষা দ্বারা প্রমাণের উদ্দেশ্যে বর্ণালী মাপক একটি বিশেষ ধরণের বর্ণালীবীক্ষণ যন্ত্র তৈরী করেন। বস্তুর অণুতে আলোকের সংখ্যাতে

www.purepdfbook.com

আলোক কম্পন সংখ্যা কম বেশী হওয়ার ফলে যে আলোকের বিকিরণ ঘটে তার ক্ষীণ দীপ্তি বর্ণালী বীক্ষণযন্ত্রে ধরা পড়ে।

একই তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের আলোকরশ্মি বেনজিন, টলুইন প্রভৃতি জৈব তরল পদার্থের ওপর ফেললে ঐ তরল পদার্থ থেকে বিচ্ছুরিত আলোতে আপতিত তরঙ্গ দৈর্ঘ্য ছাড়াও ছোটবড় তরঙ্গ দৈর্ঘ্য বর্ণালীবীক্ষণ যন্ত্রের প্লেটে ধরা পড়ে। এর থেকে তিনি এক নতুন তথ্য আবিষ্কার করেন যা বিজ্ঞান জগতে রামন এফেক্ট নামে পরিচিত।

কঠিন, তরল অথবা বায়বীয় স্বচ্ছ বস্তর মধ্যে দিয়ে যখন আলো যায় তখন সেই আলোর মধ্যে কিছু প্রকৃতিগত পরিবর্তন দেখা যায়। একেই বলে রামন এফেক্ট। আলোকরশ্মি বিসরিত করে রামন বর্ণালীতে যে একাধিক নতুন আলোক রেখার সন্ধান পান তাকে রামন লাইন বলে। রামন এফেক্ট এর মাধ্যমে প্রমাণিত হয় আলোর ফোটন কণিকা অণুর সঙ্গে সংঘাত ঘটিয়ে পরমাণুর গতিশক্তি থেকে কিছু শক্তি সংগ্রহ করে আরো শক্তিশালী হয়ে ওঠে। যার ফলে আলোর তরঙ্গ দৈর্ঘ্য কমে যায়।

১৯৩০ সালে এই আবিষ্কারের জন্য তিনি নোবেল পুরষ্কার লাভ করেন।

প্লুটো (১৯৩০)

পার্সিভাল লাওয়েল ও টম বাউ

নেপচুন আবিষ্কারের পরও বিজ্ঞানীদের মনে হতে লাগল নেপচুনের পরও গ্রহ থাকতে পারে।

১৯০৫ সালে উত্তর আমেরিকার প্রসিদ্ধ জ্যোর্তিবিজ্ঞানী ফ্ল্যাগ্স্টাফ মানমন্দিরের প্রতিষ্ঠাতা পার্সিভাল লাওয়েল গণনা করে দেখলেন আবিষ্কৃত সব গ্রহগুলির আকর্ষণ হিসাব করলেও ইউরেনাসের গতির গরমিল থেকে যাচ্ছে। নেপচুনের পরও কোনো গ্রহ থাকলে তবেই এটা হওয়া সম্ভব। নয় বছর ধরে অনেক পরিশ্রম করে ১৯১৪ সালে তাঁর গবেষণার বিবরণ প্রকাশ

www.purepdfbook.com

করলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্য ১৯১৬ সালে আকস্মিকভাবেই তাঁর মৃত্যু হয়।

তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর সহকর্মীরা অজানা গ্রহটির অনুসন্ধান কাজ শুরু করলেন। পার্সিভালের প্রতিষ্ঠিত মানমন্দিরের নাম দেওয়া হল লাওয়েল মানমন্দির। এই মানমন্দিরে কোনো শক্তিশালী দূরবীণ ছিল না। তাই অনুসন্ধান কাজ চালানোর জন্য ১৩ বছর পর ১৯২৯ সালে এক শক্তিশালী নতুন দূরবীণ বসানো হল, তরুণ গবেষক টম বাউ আকাশের সম্ভাব্য স্থানগুলি ঐ দূরবীণ দিয়ে পর্যবেক্ষণ করে ১৯৩০ সালের ১৩ মার্চ আবিষ্কার করলেন নতুন গ্রহটিকে।

সূর্য থেকে বহুদূরে মহাকাশের অন্ধকারাচ্ছন্ন অঞ্চলে প্লুটোর অবস্থান, তাই গ্রীক পুরাণে বর্ণিত অন্ধকার পাতাল পুরীর দেবতা প্লুটোর নাম অনুসারে এই নতুন গ্রহের নাম দেওয়া হল প্লুটো। এই নামকরণ অন্যদিক দিয়েও সার্থক। প্লুটো নামের প্রথম দুই অক্ষর পি এবং এল। পার্সিভাল লাওয়েল এর নামেরও আদ্যক্ষর পি এবং এল।

সূর্য থেকে প্লুটোর দূরত্ব ৩৬৭ কোটি মাইল, ২৪৮ বছরে প্লুটো সূর্যকে একবার প্রদক্ষিণ করে। প্লুটোর ব্যাস ৪০০০ মাইল।

মহাজাগতিক রশ্মিতে মেসন কণার উপস্থিতি (১৯৩৭)

হোমি জাহাঙ্গীর ভাবা (১৮০৯-১৯৬৬)

বহির্বিশ্ব থেকে বিভিন্ন মৌলিক কণিকা বা তড়িতাবিষ্ট কণিকা সমূহ বায়ুমণ্ডল ভেদ করে অতি দ্রুতবেগে আমাদের পৃথিবীর ওপর বর্ষিত হচ্ছে। বায়ুমণ্ডলে প্রবেশ করার সময় এই তড়িতাবিষ্ট কণিকাগুলি বায়ুমণ্ডলের

www.purepdfbook.com

পরমাণুর সঙ্গে ধাক্কা লেগে বিদ্যুৎকণার বৃষ্টি ঘটায়। এই তড়িৎ কণিকার স্রোত আসে সূক্ষ্ম তরঙ্গের আকারে এবং আলোকরশ্মির মত তা চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ে। এরই নাম মহাজাগতিক রশ্মি। প্রোটন, নিউট্রন, মেসন আলফা কণা, ভারি নিউক্লিয়াস, লৌহ, অক্সিজেন, কার্বন প্রভৃতি হল এর উপাদান।

১৯৩৭ সালে ইংরাজ বিজ্ঞানী হাইটলার ও ভারতীয় বিজ্ঞানী ডঃ হোমি জাহাঙ্গীর ভাবা মহাজাগতিক রশ্মির অদ্ভুত ক্রিয়াকলাপ সম্পর্কে মূল্যবান তথ্য আবিষ্কার করেন।

বোম্বাই-এর এলফিনস্টোন কলেজ ও রয়েল ইনস্টিটিউট অব সায়েন্স থেকে গ্র্যাজুয়েট হয়ে শ্রীভাবা ১৯২৭ সালে কেমব্রিজে যান এবং ১৯৩০ সালে ইঞ্জিনিয়ারিং ট্রাইপস পরীক্ষায় পাশ করেন। এ সময়ই নীল্স বোর, মাক্সবোর্ণ, ফের্মি, ডিরাক প্রভৃতি বিখ্যাত পদার্থবিদ্দের সংস্পর্শে এসে তিনি মহাজাগতিক রশ্মি নিয়ে গবেষণায় উৎসাহী হন। ১৯৩৭ সালে কোপেনহেগেন বোর ইনস্টিটিউটে কিছুদিন গবেষণা করার পর অধ্যাপক হাইটলারেব সহযোগে 'কাস্কেড থিয়োরী অফ কসমিক-রে শাওয়ার্স' এই তত্ত্ব আবিষ্কার করেন। শ্রীভাবার প্রথম গবেষণাপত্র ছিল 'গামা বিকিরণের শোষণ এবং এ ব্যাপারে ইলেকট্রন বর্ষণের ভূমিকা।' হাইটলারের সঙ্গে গবেষণা করতে গিয়ে শ্রীভাবা ঐ বিদ্যুৎকণার বর্ষণের মধ্যে নতুন এক পারমাণবিক বস্তু কণার খোঁজ পেলেন, যাঁর ক্ষরণ আইনস্টানের আপেক্ষিকতাবাদ মেনে চলে।

শ্রীভাবা ঐ কণাগুলির নাম দেন মেসন। সুদীর্ঘ পথ পার হবার সময় মহাজাগতিক রশ্মির উপাদন নিউট্রন, প্রোটন প্রভৃতি বিভিন্ন কণিকার পরস্পর সংঘাতে এই মেসন কণার সৃষ্টি। মহাজাগতিক রশ্মি যখন বায়ুমণ্ডলের সাথে ধাক্কা খেয়ে বিদ্যুৎকণার বা ইলেকট্রন কণার বর্ষণ ঘটায় তখন তার মধ্যেও এই মেসন কণা থাকে। অর্থাৎ পৃথিবীতে যে মহাজাগতিক রশ্মি এসে পৌঁছচ্ছে তার তিন-চতুর্থাংশই এই মেসন কণা। বায়ুমণ্ডল অতিক্রম করে আসার সময় মহাজাগতিক রশ্মি দুর্বল হয়ে পড়ে এবং সেখান থেকে উৎপন্ন কণিকাগুলি তাপশক্তিতে রূপান্তরিত হয়ে যায়। কেবল মেসন কণাগুলি ভূস্তর ভেদ করে নীচে চলে গিয়ে ক্ষয়প্রাপ্ত হয়ে যায়।

১৯৪০ সালে বিশ্বযুদ্ধ শুরু হলে তিনি ইংলণ্ড থেকে দেশে এসে ব্যাঙ্গালোরে ইণ্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ সায়েন্সে মহাজাগতিক রশ্মি নিয়ে

www.purepdfbook.com

গবেষণা শুরু করেন। তিনি ভারতে পরমাণু শক্তির উন্নয়নে সর্বশক্তি নিয়োগ করেছিলেন এবং জীবনের শেষদিন পর্যন্ত ছিলেন আর্ন্তজাতিক পারমাণবিক শক্তি কমিশনের বিজ্ঞান বিষয়ক কমিটির উপদেষ্টা।

যক্ষ্মার প্রতিষেধক স্ট্রেপটোমাইসিন (১৯৪২)

ডঃ সেলমন অ্যাব্রাহাম ওয়াক্সম্যান (১৮৮৮)

ডঃ সেলমন অ্যাব্রাহাম ওয়াক্সম্যান যখন কিশোর তখন তাঁর ছোটবোন উপযুক্ত ওষুধের অভাবে ডিপথেরিয়া রোগে মারা যায়। বোনের মৃত্যুতে প্রচণ্ড মানসিক আঘাত পেয়ে তিনি প্রতিজ্ঞা করেছিলেন মানুষের দুরারোগ্য ব্যাধিগুলো দূর করার জন্য তিনি ডাক্তার হয়ে ওষুধ আবিষ্কার করবেন।

১৯১০ সালে ২২ বছরের যুবক ওয়াক্সম্যান কৈশোরের শপথের কথা ভুলে জন্মভূমি ইউক্রেন ছেড়ে আমেরিকার নিউজার্সির রুজার্স বিশ্ববিদ্যালয়ে মৃত্তিকা-রসায়ন পড়তে আসেন।

১৯১৫ সালে তিনি মৃত্তিকা রসায়নে ডিগ্রী লাভ করেন এবং ঐ বছরই তিনি কবরখানার কাছাকাছি অঞ্চলের মাটি থেকে স্ট্রেপটোমাইসেস গ্রিসিয়াস নামক এক আণুবীক্ষণিক জীবাণুর সন্ধান পান। ঐ জীবাণুর ওপর তিনি একটি গবেষণাপত্রও লিখেছিলেন।

১৯২০ সাল থেকে ৩০ সাল পর্যন্ত তিনি রুজার্স বিশ্ববিদ্যালয়ে মৃত্তিকার উর্বরতা বৃদ্ধির উপায় নিয়ে গবেষণা করেছিলেন। এ সময়ই তিনি নাইট্রোজেন ঘটিত সার উৎপাদন বৃদ্ধির সহায়ক এই তথ্য আবিষ্কার করেন।

১৯২৮ সালে ফ্লেমিং-এর পেনিসিলিন আবিষ্কারের ফলে জীবাণুর বিরুদ্ধে অ্যান্টিবায়োটিকের প্রচলন শুরু হয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হলে পেনিসিলিন ছাড়া ছত্রাক থেকে অন্য কোনো ওষুধ পাওয়া যায় কিনা তা নিয়ে বিজ্ঞানীরা গবেষণা শুরু করলেন। ডঃ ওয়াক্সম্যানও তাঁর পূর্ব আবিষ্কৃত স্ট্রেপটোমাইসেস গ্রিসিয়াস জীবাণু নিয়ে গবেষণা শুরু করলেন। শেষপর্যন্ত ১৯৪২ সালে

www.purepdfbook.com

আবিষ্কৃত হল পেনিসিলিনের চেয়েও শক্তিশালী অ্যান্টিবায়োটিক স্ট্রেপটোমাইসিন।

১৯৫২ সালে চিকিৎসাবিজ্ঞান ও শারীরবিদ্যা বিষয়ে নোবেল প্রাইজ পেলেন তিনি।

কান, নাক, গলার চিকিৎসায়, টাইফয়েড, কলেরা, অন্ত্রের ঘা, অ্যাপেণ্ডিসাইটিস ও যক্ষ্মা রোগে স্ট্রেপটোমাইসিন কাজ দেয়।

পলিথিন ও টেরিলিন

একসময় মানুষের ধারণা ছিল রসায়নাগারে প্রকৃতিজাত জিনিষ তৈরী করা সম্ভব নয়। কিন্তু বর্তমান যুগে মানুষ কার্বন, হাইড্রোজেন, নাইট্রোজেন ও অক্সিজেন এই কয়েকটি মৌলিক পদার্থের সহযোগে তৈরী করেছে লক্ষ লক্ষ জৈব পদার্থ। তুলা, পাট, রেশম এইসব প্রকৃতিজাত পদার্থগুলিই এক সময় মানুষের বস্ত্রের চাহিদা মেটাত, কিন্তু বর্তমানে প্রকৃতিজাত তন্তুর স্থান দখল করে নিচ্ছে কৃত্রিম তন্তু। এই কৃত্রিম তন্তুর মধ্যে টেরিলিনের চাহিদাই সবচেয়ে বেশী। টেরিলিনের নানা দেশে নানারকম নাম।

টেরিলিন তৈরী হয় অজৈব উপাদন থেকে। সেটি হল পলিস্টার নামক এক বহুযৌগিক পদার্থ। জৈব বা অজৈব অ্যাসিড ও অ্যালকোহলের ক্রিয়ায় যে যৌগিক পদার্থ তৈরী হয় তাকেই বলে এস্টার। বিভিন্ন ধরণের অ্যাসিড ও অ্যালকোহলের ক্রিয়ায় বিভিন্ন ধরণের এস্টার তৈরী হয়। তার মধ্যে ইথিলিন টেরপথ্যালেট এস্টার থেকেই তৈরী হয় টেরিলিন।

কোনো এস্টার অণুকে একক করে বারবার সংযোজন করে শেষে উৎপন্ন হয় এক বিরাট এস্টার অণু, তখন সেটাকে বলে পলিএস্টার। টেরিলিন তৈরীর জন্য ইথিলিন টেরিপথ্যালেট এস্টার অণু তৈরী হয় টেরোপথ্যালিক অ্যাসিড ও ইথিলিন গ্লাইকলের বিক্রিয়ায়। এবার ইথিলিন টেরিপথ্যালেট এস্টারের অণুকে বারবার সংযোজন করে যে পলিএস্টার তৈরী হয় তার

www.purepdfbook.com

নাম টেরিলিন।

টেরিলিন তৈরী হওয়ার পর তাকে গলিত অবস্থায় যন্ত্রের অতি সূক্ষ্ম ছিদ্রের ভেতর দিয়ে পাঠিয়ে সুতোর আকৃতি দেওয়া হয়। এবার এই রঙহীন তন্তুকে রঙ করার জন্য তন্তুর ওপর কোনো রঙের প্রলেপ লাগিয়ে গরম করা হয়, ফলে রঙের অণুগুলি তন্তুর মধ্যে ঢুকে পড়ে ও সহজে বের হতে পারে না। তাই রঙটাও পাকা হয়। এই রঙিন তন্তুকে প্যাকিং করে মেসিনের মাধ্যমে পাকিয়ে সুতো তৈরী হয়। সেই সুতো দিয়ে তৈরী হয় টেরিলিন কাপড়। কাপড় ছাড়াও টেরিলিন দিয়ে দড়ি, মাছ ধরার জাল, নৌকোর পাল, প্রভৃতি তৈরী হয়।

যখন কোনো রাসায়নিক এককের পুনঃপুনঃ সংযোগের ফলে একটি বৃহৎ অণু সৃষ্টি হয় তখন তাকে বলে পলিমার। ইথিলিন অণুতে আছে দুটি কার্বন ও চারটি হাইড্রোজেন পরমাণু। এই একককে ৩০ থেকে ৪০ বায়ুমণ্ডল চাপে উত্তপ্ত ক্রোমিক অক্সাইড নামক প্রভাবকের উপস্থিতিতে ১২০° সেন্টিগ্রেড থেকে ১৫০° সেন্টিগ্রেডে উষ্ণতায় বারবার সংযোগের ফলে যে বৃহত্তম আণবিক ওজনের অতিকায় কার্বন ও হাইড্রোজেন দ্বারা গঠিত অণু তৈরী হয় তারই নম পলি-ইথিলিন। এর ফর্মূলা হল $(C_2H_4)^n$। n এখানে একটি অজানা বৃহত্তম সংখ্যা।

পলিথিন দিয়ে ব্যাগ, পাত্র, টেবিল ক্লথ, নল, খেলনা সব কিছুই তৈরী করা সম্ভব হচ্ছে।

পাইরোসেরাম (১৯৪৯)

ডোনাল্ড স্টোকে

১৯৪৯ সালে আমেরিকার বিজ্ঞানী ডোনাল্ড স্টোকে কাচের প্লেটের ওপর ফটো তোলা যায় কিনা সে সম্পর্কে গবেষণা করছিলেন। একদিন তিনি কাচ তৈরীর উপাদানগুলি একসঙ্গে মিশিয়ে ৬০০° সেন্টিগ্রেড উত্তাপে

www.purepdfbook.com

গরম করার জন্য গবেষণাগারের চুল্লীর ওপর রেখেছিলেন। গবেষণার জন্য অন্যান্য প্রয়োজনীয় কাজ করতে গিয়ে এক সময় তিনি ভুলেই গেলেন সেকথা।

ডোনাল্ড স্টোকের সেদিন ছিল এক বন্ধুর বাড়ী নিমন্ত্রণ, গবেষণার কাজে বেশ রাত হয়ে যেতে তিনি তাড়াতাড়ি গবেষণাগার বন্ধ করে চলে গেলেন বন্ধুর বাড়ীতে, রাতে আর ফিরলেন না গবেষণাগারে।

পরদিন গবেষণাগারে এসে দেখেন কাচের উপাদনগুলো তখনও উনুনেই বসানো রয়েছে। আর জমাট বেঁধে কাচের মতই স্বচ্ছ কঠিন বস্তুতে রূপান্তরিত হয়েছে। একটু ভুলের জন্য এতটা জিনিস নষ্ট হয়ে গেল ভেবে তাঁর মন খারাপ হয়ে গেল। তিনি ঐ বস্তুটাকে হাতে নিয়ে দেখতে লাগলেন।

হঠাৎ হাত ফস্‌কে বস্তুটি পড়ে গেল মাটিতে। কিন্তু পড়ে গিয়েও বস্তুটি অক্ষত রইলো, স্টোকে অবাক হলেন, কারণ তিনি বস্তুটিকে কাচ বলেই ভেবেছিলেন। তিনি মাটি থেকে তুলে আবার সজোরে মাটিতে ফেললেন। তবু ভাঙলো না। হাতুড়ীর আঘাত দিলেন, তবু একটা টুকরোও খসলো না পিণ্ড থেকে। লোহায় আঘাত করলে তার যেমন দৈহিক পরিবর্তন হয়, এক্ষেত্রে তাও হল না। বস্তুটি ছিল লোহার চেয়েও শক্ত অথচ অ্যালুমিনিয়ামের চেয়েও হাল্কা এবং কাচের মত স্বচ্ছ।

কতটা উত্তাপে এবং কতক্ষণ ধরে ঐ মিশ্রিত উপাদনগুলি উত্তপ্ত হয়ে ঐ বস্তুটিতে রূপান্তরিত হয়েছে তা জানতে পারলেন না তিনি। তাই বস্তুটি নিয়ে গবেষণায় বসলেন। নানা অ্যাসিড প্রয়োগ করলেন, ক্ষারের সাথে ফোটালেন। প্রচণ্ডভাবে উত্তপ্ত করলেন। কিছুতেই বস্তুটি গলে গেল না। দিনরাত গবেষণা করে একসময় তিনি বুঝতে পারলেন ঠিক কতটা উত্তাপে ঐ নতুন বস্তুটি তৈরী হতে পারে। বস্তুটির গুণাগুণ দেখে তিনি নাম দিলেন পাইরোসেরাম।

পাইরোসেরামের মত অদ্ভুত জিনিস আবিষ্কার করে ডোনাল্ড স্টোকের নাম ছড়িয়ে পড়ল। আমেরিকার মহাকাশ ও বিমান সংস্থা ডোনাল্ড স্টোকের সাথে চুক্তি করে পাইরোসেরামের ব্যবহার শুরু করল।

www.purepdfbook.com

পরীক্ষা করে দেখলেন যে পোলিও তিন ধরণের। আরো গবেষণা চালিয়ে তিনি পোলিও রোগের প্রতিষেধক টিকা আবিষ্কার করলেন।

জীবজন্তুর ওপর প্রয়োগ করে সফলতা পেলেন। তারপর ১৯৫৩ সালে প্রথমে নিজের দেহে তারপর পরিবারের সকলের দেহে পোলিওর টিকা দিলেন। কোনো খারাপ লক্ষ্মণ দেখা গেল না। ক্রমে শিশুদের দেহে প্রয়োগ করে দেখলেন তাদের আর পোলিও হল না।

জোনাস সল্ক তাঁর এই আবিষ্কারের পেটেন্ট নিয়ে বহু টাকা রোজগার করতে পারতেন। কিন্তু তা না করে তিনি সকলকে জানিয়ে দিলেন পোলিও প্রতিষেধক টিকা প্রস্তুত প্রণালী।

পোলিও টিকা শিশুর জন্মের কয়েক মাস পর থেকে এক মাস অন্তর তিনবার দিতে হয়।

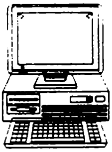

ইন্টারনেট (১৯৮০)
টিম বার্নার্স লি

বিশ শতকের এক বিরাট আবিষ্কার হল ইন্টারনেট। শব্দটা নতুন হলেও এর সূচনা হয়েছিল ১৯৬৯ সালে। পৃথিবীর দুই বিরাট শক্তিশালী দেশের মধ্যে তখন চলছে ঠাণ্ডা লড়াই। দুই দেশই পরমাণু বোমায় ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার আশঙ্কা করছে। তখন দুই দেশেরই প্রতিরক্ষা দপ্তরের প্রধান চিন্তা হয়ে উঠল যে পরমাণু বোমার ক্ষতির হাত থেকে কিভাবে তথ্য প্রচার ও যোগাযোগ ব্যবস্থাকে রক্ষা করা যায়। আমেরিকার প্রতিরক্ষা বিশেষজ্ঞরা প্রথম একটি উপায় খুঁজে পেলেন।

www.purepdfbook.com

পেণ্টাগন শহরে তখন তথ্য প্রচারে কম্পিউটারের ব্যবহার শুরু হয়ে গেছিল। তাঁরা ভাবলেন কম্পিউটারের তথ্যগুলিকে যদি বিভিন্ন ভাগে ভাগ করে অনেকগুলি চ্যানেলে পাঠানো যায় তাহলে কোনো কারণে একটা চ্যানেল ক্ষতিগ্রস্ত হলেও অন্য চ্যানেলের মাধ্যমে তথ্য পাঠানো যাবে। প্রতিরক্ষা বিভাগের অ্যাডভান্স রিসার্চ প্রজেক্ট এজেন্সির (আরপা) অধিকর্তা বব টেলর আরপানেট নামক একটি নেটওয়ার্ক তৈরী করে ফেললেন। এভাবে প্রতিরক্ষা স্তরে তথ্য প্রচারের কাজ শুরু হল। এই পদ্ধতিতে তথ্য গোপন ভাবে প্রচার করার সুবিধাও ছিল।

কম্পিউটারের সঙ্গে টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থার প্রথম সংযোগ ঘটে ১৯৪০ সালে। নিউ হ্যাম্পশায়ারের ডার্টমাউথ কলেজ থেকে নিউইয়র্কের বেল ল্যাবরেটরিজ-এর একটি ক্যালকুলেটরে টেলিগ্রাম লাইনের মাধ্যমে ডঃ জর্জ স্টিবৎস তথ্য পাঠিয়েছিলেন।

১৯৮০ সালে ঘটল এক চমকপ্রদ ঘটনা। সেসময় সফ্‌ট ওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার টিম বার্নার্স-লি কাজ করছিলেন সুইজারল্যান্ডের জেনিভায় 'ইউরোপিয়ান ল্যাবরেটরি ফর পার্টিক্‌ল ফিজিক্‌স'-এ। তিনি ভাবতে লাগলেন এমন একটা কম্পিউটার প্রোগাম তৈরী করলে হয় যেটা মানুষের মস্তিষ্কের মত কাজ করবে। মস্তিষ্কের মতই সেখানে সঞ্চিত থাকবে তথ্য, প্রয়োজনে সুইচ টিপে সেই তথ্য জেনে নেওয়া যাবে। এই ভাবনা থেকেই তিনি 'হাইপার টেক্সট' নামে এক নতুন সফ্‌ট ওয়্যার তৈরী করলেন। এর মাধ্যমে তাঁর কম্পিউটারে রাখা তথ্যগুলোকে পরস্পর জুড়ে দিলেন। প্রতিটি তথ্যকে পৃথক সংখ্যায় চিহ্নিত করলেন। ঐ সংখ্যার মাধ্যমে এক তথ্য থেকে আরেক তথ্যে যাতায়াত করতে লাগলেন। বন্ধুদেরও অনুরোধ করলেন তাঁদের কম্পিউটারের তথ্যগুলিকে এই নতুন সফ্‌টওয়ারের মাধ্যমে তাঁর কম্পিউটারের সঙ্গে জুড়ে দিতে। এরপর তিনি 'হাইপারটেক্সট মার্ক ল্যাঙ্গয়েজ' নামক বিশেষ 'কোডিং সিস্টেম' তৈরী করলেন। এর মাধ্যমে যেকোনো কম্পিউটারের যেকোনো দুটি তথ্যের মধ্যে যোগসূত্র গড়ে উঠল। যাকে বলে 'হাইপার টেক্সট ট্রান্সফার প্রোটোকল।' এজন্য প্রতিটি তথ্যকে নিজস্ব পরিচয় দেওয়া হয়।

কম্পিউটারের নেটওয়ার্ক যখন নির্দিষ্ট অঞ্চলের কম্পিউটারগুলির মধ্যে তামার তার বা অপটিকাল ফাইবার দিয়ে সংযোগ করা হয় তখন তাকে

www.purepdfbook.com

বলে লোকাল এরিয়া নেটওয়ার্ক বা ল্যান। আর যখন নেটওয়ার্কের বিস্তার কোনো নির্দিষ্ট গণ্ডীর মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে না তখন তাকে বলে ওয়াইড এরিয়া নেটওয়ার্ক বা ওয়ান। এই নেটওয়ার্কে কম্পিউটারগুলির সংযোগ করার জন্য মাইক্রোওয়েভের সাহায্য নিতে হয়।

কম্পিউটার যখন তথ্য পাঠায় তখন সেটি নির্দিষ্ট সাংকেতিক ভাষা ব্যবহার করে। অন্যপ্রান্তের নির্দিষ্ট একটি কম্পিউটারের সংকেতের সাথে সেই সংকেত মিলে গেলেই তথ্য নির্দিষ্ট জায়গায় পৌঁছে যায়।

ইন্টারনেটে কম্পিউটারে পাঠানো বৈদ্যুতিক সংকেত দুটি নির্দিষ্ট বৈদ্যুতিক মানের মধ্যে তাৎক্ষণিক ওঠানামা করে। তাই এই সংকেতকে বলে পালস। এই পালসকে গন্তব্যস্থলে পৌঁছাবার জন্য মডিউলেটর ডিমডিউলেটর বা মোডেম নামক একটি যন্ত্রের সাহায্য নেওয়া হয়। এটি রাখা হয় কম্পিউটার ও টেলিফোন লাইনের মধ্যে। মোডেম কম্পিউটারে পাঠানো পালসের দুটি আলাদা বৈদ্যুতিক মানের জন্য আলাদা আলাদা দুটি নির্দিষ্ট কম্পাঙ্কের একটানা সংকেত তৈরী করে টেলিফোন লাইনে চালু করে। আবার ঐ কম্পিউটারে সংকেত নেওয়ার আগে নির্দিষ্ট কম্পাঙ্কের একটানা সংকেতকে পালসে নিয়ে আসে। অর্থাৎ ইন্টারনেটের সুবিধা পাবার জন্য একটি পার্সোনাল কম্পিউটার, একটি মোডেম এবং একটি এস. টি. ডি লাইন থাকলেই হলো।

ইন্টারনেটের সবথেকে বড় সুবিধে হল এক প্রান্তের গ্রাহক তার বক্তব্য কি- বোর্ডের মাধ্যমে কম্পিউটারে ঢুকিয়ে নির্দিষ্ট কোনো সময়ে অন্যপ্রান্তের নির্দিষ্ট নম্বরে ডায়াল করার নির্দেশ দিতে পারেন। লাইন পেলেই অন্য প্রান্তের ব্যক্তির কম্পিউটারে সেটি স্থানান্তরিত হয়ে যাবে। সে ব্যক্তি যদি তখন ঐ কম্পিউটারের কাছে না থাকেন তবে তার সুবিধামত সময়ে তিনি কি-বোর্ডের মাধ্যমে নির্দেশ দিলেই তাঁর কাছে পাঠানো সব তথ্য ডিসপ্লে বোর্ডে ফুটে উঠবে।

দুটি কম্পিউটারের মধ্যের দূরত্ব যদি বেশী হয় এবং দূরত্বের কারণে যদি সেখানে টেলিফোন লাইনের সাহায্যে যোগাযোগ গড়ে তোলা সম্ভব না হয় তবে সেখানে যোগাযোগের কাজে সাহায্য করে যোগাযোগ উপগ্রহ।

ইন্টারনেটের মাধ্যমে চিঠি, ছবি ইত্যাদি পাঠাবার সুযোগও মিলছে। এর নাম হল ই-মেল। পৃথিবীর যেখানেই ই-মেল পাঠানো হোক না কেন তার

www.purepdfbook.com

খরচ পড়ে কয়েক টাকা মাত্র। আর সবচেয়ে বড় সুবিধা যাকে লেখা হচ্ছে সে ছাড়া ঐ চিঠি আর কেউ পড়তে পারবে না। ই-মেল যেমন লিখে লিখে কথা বলা তেমনি ইন্টারনেট ফোনের মাধ্যমে টেলিফোনের মত কথাবার্তাও বলা যায়। এক্ষেত্রে বাক সংকেতকে ইন্টারনেট ফোন সফ্‌ট ওয়্যার ডিজিটাল সংকেতে রূপান্তরিত করে পাঠায় ইন্টারনেটের মাধ্যমে।

www.purepdfbook.com

‘সহজ বিজ্ঞান গ্রন্থমালা’র অন্যান্য বই

সেরা বিজ্ঞানীদের ছেলেবেলা / ১৫.০০

বিজ্ঞানের ম্যাজিক / ২০.০০

বিজ্ঞানের হঠাৎ আবিষ্কার মজার আবিষ্কার / ২০.০০

বিজ্ঞানের ১০০ আবিষ্কার / ৩০.০০

ভারতীয় বিজ্ঞানী / ২০.০০

শতাব্দীর সেরা পঁচিশটি আবিষ্কার / ২০.০০

১০০ কি আর ১০০ কেন / ২৫.০০

মহাকাশ রহস্য / ২৫.০০

www.purepdfbook.com

১০ মিনিট স্কুল all pdf বই - Click here

কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স 2021 all Month pdf - Click here

আয়মান সাদিক ও সাদমান সাদিক ভাইদের all pdf বই - Click here

এরকম আরো বই পেতে ভিজিট করুন।
https://www.purepdfbook.com

ফেসবুকে আমি - মোঃহৃদয়